العقيدة وأثرها في بناء الجيل

আকিদাহর পরিশুদ্ধি

উম্মাহর মুক্তিপথ

ড. আবদুল্লাহ আযযাম

বিষয়সূচি

শুরুর কথা | ১৭

ভূমিকা

মানবহৃদয় গঠনে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ | ২৯

প্রথম অধ্যায়

আকিদাহ-পরিচিতি | ২৮

আকিদাহ কী | ২৮
প্রথম রুকন : শাহাদাতান | ২৯
দ্বিতীয় রুকন : মালাক | ৩৫
তৃতীয় রুকন : আসমানি গ্রন্থ | ৩৬
চতুর্থ রুকন : নবি-রাসুল | ৩৯
পঞ্চম রুকন : আখিরাত | ৩৯
ষষ্ঠ রুকন : ভাগ্য | ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদাহগত বিকৃতি : মানবজাতির বিপর্যয় | ৪৪

আকিদাহর বাস্তবতা | ৪৪
আকিদাহর গুরুত্ব | ৪৫
দর্শন ও কালামশাস্ত্র | ৪৮
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আকিদাহ বিকৃতি | ৫৩
আকিদাহ বিকৃতির ফলাফল | ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য | ৬১

বিজ্ঞান ও ধর্ম | ৬১
আল্লাহর অস্তিত্ব ও বিজ্ঞান | ৬২

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

আকিদাহর ছায়ায় | ৬৫
ইবাদত ও মুআমালাত | ৬৮
আকিদাহর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব | ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর পরিচয় : আকিদাহর মূল বুনিয়াদ | ৭৮
আল্লাহর সিফাত-পরিচিতি | ৭৮
সিফাতের মাসআলায় চারটি মাযহাব (মত ও পন্থা) | ৭৯
মুশাব্বিহাহ ও মুজাসসিমাহ | ৭৯
মুয়াত্তিলাহ ও জাহমিয়াহ | ৮০
সালাফদের আকিদাহ | ৮০
পরবর্তীদের আকিদাহ | ৮৫
আমাদের আকিদাহ | ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি : আকিদাহর স্তম্ভ | ৯০
দাসত্বের প্রথম শর্ত | ৯০
ভ্রান্তির অপনোদন | ৯২
মানবজীবনে আল্লাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা | ৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শরিয়াহ-প্রত্যাখ্যান : বড় কুফর | ৯৯
দাসত্ব কেবল স্রষ্টার | ৯৯
আল্লাহ ও রাসুলের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ | ১০৩
শর্তহীন আত্মসমর্পণ | ১০৫
কুরআন-সুন্নাহ প্রকাশ্য অর্থে | ১০৭
গভীর ষড়যন্ত্র | ১০৮
জাহিলিয়াতের বিধান | ১১১

সপ্তম অধ্যায়

অপব্যাখ্যার কবলে বিধানপ্রণয়নসংক্রান্ত আয়াত | ১১৩

নিগূঢ় বাস্তবতা | ১১৩

ভ্রান্ত যুক্তি | ১২১

ভ্রান্তির অপনোদন | ১২২

যুক্তি-২ : কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর) | ১২২

খণ্ডন | ১২৫

যুক্তি-৩ : কুফরের জন্য জুহুদ ও ইসতিহলাল শর্ত | ১২৭

খণ্ডন | ১২৮

যুক্তি-৪ : হাকিমিয়াহসংক্রান্ত আয়াত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য অবতীর্ণ | ১৩০

খণ্ডন | ১৩২

সারসংক্ষেপ | ১৩৭

শেষ কথা | ১৪১

অষ্টম অধ্যায়

আকিদাহর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি : পরিণাম-পরিণতি | ১৪৪

করুণ পরিণতি | ১৪৪

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা | ১৪৬

বিপরীতমুখী দৃশ্য | ১৪৮

হৃদয়ে গাঁথা আকিদাহ | ১৪৯

আকিদাহর ছায়াতলে | ১৫২

নবম অধ্যায়

কীর্তিমানের কীর্তিগাঁথা | ১৫৪

জীবনচিত্র | ১৫৪

যে সমাজ আকিদাহয় গড়া | ১৫৮

এক প্রাণ, এক দেহ | ১৫৯

শেষ অনুরোধ | ১৬২

শুরুর কথা

رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى

'ও রব, অন্তর প্রশস্ত করে দিন, কাজ সহজ করে দিন।'[১]

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

'ও রব, হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরগুলো বক্র করে দেবেন না। আমাদের অনুগ্রহ করুন। আপনিই তো বড় দাতা।'[২]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

'ও রব, আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, আমাদের পাকড়াও করবেন না। ও রব, আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ও রব, আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।'[৩]

رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

'ও রব, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দিন এবং আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন।'[৪]

---

[১] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ২৫-২৬

[২] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮

[৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৮৬

[৪] সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০

رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

'ও রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতেও দিন। আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'[৫]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'ও রব, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।'[৬]

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

'ও রব, যেদিন হিসাব কায়িম হবে, সেদিন আমাকে, আমার বাবা-মা ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।'[৭]

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'ও রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের আগে চলে গেছে, তাদের ক্ষমা করুন। আর যারা ইমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। ও রব, আপনিই দয়াবান, পরম দয়ালু।'[৮]

এই ভেবে আমার ভালো লাগছে, ছোট একটি বইয়ে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বেশকিছু বাস্তবতা এবং বিস্মৃতপ্রায় কিছু মৌলিক বিষয় প্রিয় পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। আসলে মানুষের পুরো জীবনটাই এসবের আবর্তে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে, বরং গোটা জগৎই এসব প্রাথমিক বিষয় ধারণ ও লালন করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবজীবনে আকিদাহ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আকিদাহর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াই যে আজকের মানবজীবনের বিপর্যয়ের কারণ, তা আমি বইয়ের ভূমিকায় বেশ গুরুত্বের সাথেই আলোচনা করেছি।

পুরো বইটি আমি নয়টি অধ্যায়ে সাজিয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি

[৫] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২০১

[৬] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৪

[৭] সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৪১

[৮] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ১০

আকিদাহ ও তাওহিদের অর্থ নিয়ে। সেখানে আমি এ কথাও প্রমাণ করেছি যে, গোটা বিশ্বজগৎই আল্লাহর তাওহিদ ধারণ করে আছে এবং তাঁরই ইবাদত করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি, মানবজাতির দুঃখ-কষ্টের কারণ বিশুদ্ধ আকিদাহ রেখে বিকৃত আকিদাহয় আক্রান্ত হওয়া। তা ছাড়া বিজ্ঞান আর ধর্মের মাঝে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, সেটাও মূলত বিশুদ্ধ আকিদাহ না-থাকার কারণেই।

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে আকিদাহর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা গোটা মানবজাতিকে একটি মৌলিক ভিতের ওপর স্থির করবে।

তারপর চতুর্থ অধ্যায়ে আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি সালাফ-খালাফের[১] মতামত ও সিদ্ধান্তের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে সেই মহাসিদ্ধান্তের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই দ্বীনের আগমন। আর তা হলো আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহর শরিয়াত বর্জন করা এই দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার মূল কারণ।

সপ্তম অধ্যায়ে তাশরিসংক্রান্ত (বিধানপ্রণয়নসংক্রান্ত) আয়াতের ওইসব অপব্যাখ্যার আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো মানুষের মুখে সচরাচর উচ্চারিত হয়। পাশাপাশি এমন কিছু নসের (কুরআন ও হাদিস) অবতারণা করা হবে, যেগুলো মূলত বিতর্কের বিষয় নয়। আর নসগুলো যে প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে সামনে রেখে অবতীর্ণ হয়েছিল, আপনি সেগুলোকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বর্তমান বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করতে চাইবেন।

এরপর আসবে অষ্টম অধ্যায়। এখানে অকাট্য দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা বহু অনুসন্ধান ও ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ ইসলামি আকিদাহ থেকে সরে যাওয়া।

আর নবম অধ্যায়ের মাধ্যমে আমি সমাপ্তি টেনেছি। সেখানে আমি ওই কীর্তিমান আদর্শ পুরুষদের নিয়ে আলোচনা করেছি, যাঁরা ইসলামি আকিদাহর ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। মজবুত আকিদাহ তাঁদের কীর্তিমান করে তুলেছিল। এই বিশুদ্ধ চেতনা গোটা

---

[১] সালাফ শব্দের অর্থ পূর্বসূরী। মূলত সাহাবা কিরামই হলেন সালাফ। তবে অধিকাংশ উলামা কিরামের মতে সাহাবা কিরাম, তাবিয়ি ও তাবি তাবিয়ি, এই তিনপ্রজন্মকে সালাফ বলা হয়। খালাফ অর্থ উত্তরসূরী। মূলত সালাফের পরবর্তীকালের লোকদের খালাফ বলা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

বিশ্বের সামনে তাঁদের দাঁড় করিয়েছিল সুউচ্চ মিনার হিসেবে। যাঁদের দেখে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মানুষগুলো পথ খুঁজে পেয়েছে। সৌভাগ্যের পেছনে ছুটেচলা দলগুলো, নাজাতের জন্য ধেয়েচলা মানুষগুলো তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পেরেছে।

Boier Somahar

Click here

to join our Telegram Channel

ভূমিকা

মানবহৃদয় গঠনে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীন বাদ দিয়ে অন্য কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'[১০]

আকিদাহ এমন এক বিশ্বস্ত নিয়ন্ত্রক, যা মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে পরিচালনা করে। চালচলনে দিকনির্দেশনা দেয়। আকিদাহর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ প্রকাশ পায়। এমনকি আকিদাহ ওইসব আবেগও নিয়ন্ত্রণ করে, যা হৃদয়ানুভূতিকে মাড়িয়ে আত্মার চারপাশ আন্দোলিত করে এবং ওইসব সংশয় আর খুঁতখুঁতে ভাবও, যা সবসময় কল্পনাজগতে উড়ে বেড়ায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, আকিদাহ আচরণবিধির মগজ। তাই, এর সামান্য অংশেও যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে তা মানুষের আচার-আচরণে এক বিশাল বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে এবং সরল পথের মাঝে অঘোচানো এক দূরত্ব সৃষ্টি করবে। তাই তো কুরআন মানুষের আকিদাহগঠনে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আকিদাহ এই দ্বীনের এমন এক মৌলদর্শন, যা ছাড়া দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। এমন কোনো সুরা পাওয়া যাবে না, মাক্কি বা মাদানি যে সুরাই হোক না কেন, যেখানে মানুষকে পুরোপুরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সব আচরণকে মহান এই আকিদাহর সাথে যুক্তকরণের নির্দেশ নেই। বিশেষ করে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলো মূলত আকিদাহ গঠনের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে। আকিদাহই একমাত্র বিষয়বস্তু, যা গঠনের গুরুভার মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলো গ্রহণ করেছে।

[১০] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৩

তাই তো আমরা নিজেদের চলার পথে—একাকী হোক বা সম্মিলিত—যত বিকৃতির শিকার হচ্ছি সবকিছুর মূল কারণ, আমরা বিকৃত মতবাদ ও চিন্তাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। আজ নতুন করে মানবজাতির আকিদাহ গঠন করা খুবই জরুরি। সেই সাথে বিকৃত মতবাদ ও চিন্তাদর্শের বিশুদ্ধিও অপরিহার্য।

আল্লাহর উলুহিয়াতের (ইবাদত) একত্ব মেনে নেয়া, তাঁর বড়ত্ব অন্তরের গভীরে গেঁথে নেয়া এবং তাঁর ভালোবাসায় হৃদয়কে কানায়-কানায় পূর্ণ করে তোলা উচিত। তাঁর বড়ত্ব ও সম্মানের অনুভূতি ছাড়া অন্তরে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনটি বিষয়ের ওপর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত :

১. উলুহিয়াতের হাকিকাত (বাস্তবতা)।
২. উবুদিয়াতের (দাসত্ব) বাস্তবতা।
৩. রব ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন।[১১]

আল্লাহর পরিচয় ও মর্যাদা, বান্দা হিসেবে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যোগসূত্র—এই তিনটি বিষয় অন্তরে গেঁথে নেয়া অপরিহার্য। এর ভিত্তিতে বলা যায়, যার অন্তরে এই দ্বীনের হাকিকাত (বাস্তবতা) মজবুত হয়নি, তার কাছ থেকে শরিয়াতের শাখাগত বিষয় খোঁজা অর্থহীন। অথচ আল্লাহর বড়ত্ব মহাজগতের প্রতিটি নির্জীব-সজীব বস্তুর মাঝে প্রতিমুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রয়েছে।

সত্য কথা হলো সুমহান এই দ্বীনের বাস্তবতা ও প্রকৃতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। তাদের এক বিশাল অংশ প্রথাগত ইবাদতের কিছু বিষয় ওই অন্ধের মতো পালন করে যায়, যে হাতির লেজ আঁকড়ে ধরে মনে করে হাতির দেহ ধরে আছে। যখন তাকে বলা হয়, হাতির বিবরণ দাও তো দেখি, অমনি সে বিবরণ দিতে শুরু করে—হাতি কঠিন এক টুকরো মাংসপেশির সাথে জড়ানো কিছু লোমগুচ্ছ। সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তাকে বোঝাতে চায় ওটা হাতি নয় অন্য কিছু, তবুও তাকে তার অসাড় ধারণা থেকে ফেরাতে পারবে না।

---

[১১] উলুহিয়াত ও উবুদিয়াতের হাকিকাত বা বাস্তবতা হলো বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করবে না। কেবল আল্লাহরই ইবাদত ও দাসত্ব করবে। সেই সাথে পুরো মানবজাতিকেও এক ইলাহের ইবাদত ও দাসত্বের দিকে আহ্বান করবে। জমিনে আল্লাহর ইবাদত ও উবুদিয়াত প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবন ও সম্পদ কুরবান করবে। আর বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্কের উচ্চ মাকাম হচ্ছে ইহসান। ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখছে। আল্লাহকে না-দেখলেও বান্দার এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তো তাকে দেখছেন। [তাযা. সম্পাদক]

বর্তমানে আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটি দৃশ্য হলো, একই ব্যক্তি বিরামহীন ইবাদত করে যাচ্ছে আবার পাশাপাশি এমনসব কাজে জড়িয়ে পড়ছে যেগুলো কিনা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের করে দিচ্ছে। যেমন, কেউ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত কোনো সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করল অথবা কুরআনে বর্ণিত কোনো ফরয বিধান নিয়ে বিদ্রুপ করল। কিন্তু সে বুঝতেই পারল না এই ঠাট্টায় মূলত সে আল্লাহর বিধানকেই ঠাট্টা করল। আর ঠাট্টাকারীর মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে যাওয়া এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারে উলামা কিরাম একমত। এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত হলো দ্বীন ইসলাম অথবা আল্লাহ কিংবা রাসুলকে গালি দেয়া। যে-ই এমন জঘন্য কাজে জড়াবে, তার ওপর রিদ্দাহর[১২] হুকুম দেয়া হবে। ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, লাইস ও ইসহাক (রাহিমাহুমুল্লাহ) এমনই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাঁরা এই আয়াত দিয়ে দলিল উপস্থাপন করেছেন,

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

'আর চুক্তির পর তারা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন নিয়ে বিদ্রুপ করে, তবে কাফিরপ্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো।'[১৩], [১৪]

খুবই পরিতাপের বিষয় হলো, দ্বীন নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলার পরিণাম কতটা ভয়াবহ, তা তাদের মাথাতেই নেই। যেমন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক চুক্তি সরাসরি বাতিল হয়ে স্ত্রী পরিপূর্ণভাবে তালাক হয়ে যাবে[১৫], ইতিপূর্বে আদায়কৃত হজ বাতিল হয়ে যাবে, মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিষিদ্ধ হবে, সন্তানেরাও তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এ ছাড়াও এমন অনেক বিধান রয়েছে, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই বেখবর। কত মানুষ আছে স্ত্রীর দ্বীনকে গালাগাল করে, আবার স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও বহাল রাখে। এ নিঃসন্দেহে ব্যভিচার। তার সন্তান-সন্ততি সবই ব্যভিচারের ফসল বলেই গণ্য হবে।

আমি আবারও এক বড় বাস্তবতার কথাই বলছি। আসলেও মানুষ এই দ্বীনের হাকিকাত

---

[১২] রিদ্দাহ শব্দের অর্থ দ্বীন ত্যাগ। ইসলাম ত্যাগ করাকে রিদ্দাহ বলা হয়। তারপর চাই সে অন্য ধর্ম বা মতাদর্শ গ্রহণ করুক বা না-করুক। যে রিদ্দাহ করে তাকে বলা হয় মুরতাদ। [ভাষা-সম্পাদক]

[১৩] সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১২

[১৪] আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন (তাফসিরুল কুরতুবি)-এ বর্ণিত 'তারা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে—وطعنوا في دينكم' আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য। [লেখক]

[১৫] রিদ্দাহর কারণে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ ফুকাহা কিরামের মতে সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হয় না। (দেখুন : ফাতওয়া নং : ১০৪০০৯, ইসলামকিউএ) [ভাষা-সম্পাদক]

(বাস্তবতা ও প্রকৃতি) জানে না। তারা নিজেদের জীবনে বিভিন্ন মত-পথকে গ্রহণ করে তাদের জীবনযাত্রার একেবারে ক্ষুদ্র একটা অংশ আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও তাদের জীবনযাত্রার বিরাট অংশই প্রবৃত্তির কারসাজি বা মানবরচিত বিধান থেকে গৃহীত।

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

'তোমার কি ধারণা, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার কর্মবিধায়ক হবে? না কি তুমি মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।'[১৬]

আমার মতে, সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়াতের ফুরুয়ি (শাখাগত) মাসআলায় মনোনিবেশ করা একেবারেই অযৌক্তিক বরং এটা শূন্যে বীজ বোনার ব্যর্থ চেষ্টামাত্র।[১৭] মাটির গভীরে প্রোথিত শেকড় বিস্তারকারী কোনো বৃক্ষ ছাড়া শূন্যে তাজা ডালপালা পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য তো প্রয়োজন আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজের অনুসরণ করা। যা তিনি মানবজাতির জন্য বর্ণনা করেছেন। জরুরি হলো, মাটিতে বীজ বুনে ততক্ষণ এর পরিচর্যা করা, যতক্ষণ

---

[১৬] সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৪৩-৪৪

[১৭] আকিদাহর পরিশুদ্ধি ছাড়া শাখাগত মাসআলা-মাসায়িলের জোর দেয়া একেবারেই ব্যর্থ চিন্তা। সালাতে সুরা ফাতিহার পর আস্তে আমিন বলা কিংবা জোরে আমিন বলা, ঈদের সালাতে তাকবির-সংখ্যা ইত্যাদি মাসআলা এর অন্যতম উদারহণ। মূলত সালাফ উলামা কিরামের মাঝেই এ নিয়ে ইখতিলাফ ছিল। কিন্তু তাঁরা এগুলোকে কেন্দ্র করে না বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, না এগুলোকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করেছেন। মূলত উম্মাহর ঐক্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ওহি। আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশের সামনে প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ সাহাবা কিরামের বুঝ অনুযায়ী নুসুসকে (কুরআন-সুন্নাহ) আঁকড়ে ধরা। একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, দ্বীনের বিধানকে অর্থাৎ আকিদাহকে মৌলিক এবং ফিকহ বা আমলকে শাখাগত, এভাবে ভাগ করার বিষয়টা সালাফদের থেকে প্রমাণিত নয়। আকিদাহকে মৌলিক এবং আমলগত বিধানকে শাখাগত বললে ইসলামের বিভিন্ন আরকান বা মৌলিক ভিত যেমন সালাত, হজ, যাকাত ইত্যাদিকে অমৌলিক বা শাখাগত বলতে হয়, অথচ এটা ভুল। তবে দ্বীনের বিধান আকিদাহগত ও আমলগত—এভাবে বলা যায়। আর আমলগত বা ফিকহি বিধানে অনেক ফুরুয়ি (শাখা-প্রশাখাগত) মাসআলা বিদ্যমান। (আরও দেখুন : ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুয়ুল ফাতাওয়া : ১৯/২০৭-২১০; ড. সাদ ইবনু নাসির আশ-শাসারি, আল-উসুল ওয়াল ফুরু; আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ আল-আমির, হুসুলুল মামুল মিন কালামি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়াহ ফি ইলমিল উসুল, ড. খালিদ আবদুল লাতিফ, মাসাদিরু উসুলিদ্দিনিল মাবহাসাহ ফি উসুলিল ফিকহি) [ভাষা-সম্পাদক]

না তা সমতলে শেকড়মূলে দাঁড়াতে পারে। এরপর শাখাপ্রশাখা কেবল ছড়াতেই থাকবে। এমনিভাবে এই মহান দ্বীনের স্বার্থে আমাদের ওই পথেরই অনুসরণ করতে হবে, যা আল্লাহ এই সৃষ্টিজগতের জন্য নির্দেশ করেছেন। যেন মানুষ এই দ্বীনবহনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। আর এর জন্য আমাদের এমন একটি ভিত তৈরি করতে হবে, যার বীজগুলো মাটির গভীরে প্রোথিত। অর্থাৎ যেই ভিতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে আকিদাহর বীজ বুনে দেয়া যাবে।

আকিদাহই একমাত্র মজবুত ভিত, যার ওপর দ্বীনের সব শাখাগত বিষয় নির্ভর করে। এই ভিতের উপস্থিতি ছাড়া বড় বড় বিনির্মাণও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বলা যায়, দ্বীনের শাখাগত বিষয়াবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা মূলত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত্ত হবার নামান্তর। আর এসবের পেছনে পড়লে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে পারব না। অতএব, মানবহৃদয়ের জন্য এই দ্বীনকে উপযোগী করে তুলতে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজের অনুগামী হতে হবে। প্রথমত মানুষের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আকিদাহ গেঁথে দিয়ে, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মানুষকে শরিয়াহর যাবতীয় আদেশ মানার প্রতি উৎসাহিত করার মাধ্যমে এটি সম্ভব হবে। কারণ তারবিয়াতের (শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ) ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ (পথ-পদ্ধতি) অনুসরণ করা স্বয়ং আকিদাহরই অংশ।

আমাদের এও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর মাঝে ইলাহি মানহাজ (আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ) পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়াটা খুবই জরুরি।[১৮] যেন মনে হয় সে পৃথিবীর বুকে হেঁটে চলা এক জীবন্ত কুরআন। তার চলাফেরায় যেন মনে হয় এটি কুরআনেরই চলাফেরা। একজন দায়ির (দাওয়াতদাতা) দায়িত্ব হলো, তিনি পুরো শরিয়াহর দিকে দাওয়াত দেবেন। মানুষকে দ্বীনের মূল বিষয়ে দীক্ষিত না-করেই শাখাগত বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা কখনোই উচিত নয়; বরং দৃষ্টিকে দ্বীনের মৌলিক অবকাঠামোর দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। যখন মানুষ নিজেদের মাথায় দ্বীনের পূর্ণ একটি চিত্র এঁকে নেবে, তাদের নিয়ে দ্বীনের পরিব্যপ্ত অঙ্গনে প্রবেশ করবে। দ্বীন ও এর শাখা-প্রশাখাগুলোর বিস্তারিত শিক্ষা দেবে।

সূচনালগ্নে এভাবেই ইসলাম মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই ইসলাম দিয়ে মানুষের অন্তর পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হবে, এভাবেই করতে হবে। এর বিকল্প কোনো

[১৮] সমাজে যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবেন, সঠিক আকিদাহ, তাওহিদ ও মানহাজের দিকে আহ্বান করবেন, সর্বপ্রথম তাঁদের মাঝেই আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ প্রকাশ পাওয়া জরুরি। তাওহিদ, আকিদাহ ও আমলে তাঁদের হতে হবে দ্বীনের বাস্তব নমুনা। কুরআন-সুন্নাহ নিজের জীবনে সবার আগে প্রয়োগ করতে হবে। [ভাষা-সম্পাদক]

পন্থা নেই। এ পথই গ্রহণ করতে হবে। এসব আদেশ-নিষেধ যেমন আল্লাহ কর্তৃক ফরয, তেমনি তার অনুসরণও অলঙ্ঘনীয় ফরয। এভাবে মানুষের অন্তর গঠনেও আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ মেনে চলা ফরয। আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ পরিত্যাগ করলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতা বয়ে আনবে। আল্লাহর দ্বীন তো কখনো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া টেকেনি, আর টিকবেও না। বিশ্বজগতের রব যে মানহাজ বর্ণনা করেছেন, তার অনুবর্তী হওয়া ছাড়া এর ভিত কখনোই দাঁড়াবে না। দ্বীনের বাস্তব দীক্ষা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য মানবসৃষ্ট সব মানহাজই ব্যর্থ হতে বাধ্য, বরং এটা দ্বীনের সাথে খেলতামাশা।

এই দ্বীনকে মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত মজবুত মানহাজই অবলম্বন করতে হবে। এ মানহাজের চিত্রই আল্লাহ ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এ পথেই মানবজাতির নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলেছিলেন।

প্রথমে আকিদাহর পাঠ দিয়েই শুরু করতে হবে। মানবজাতির প্রকৃত ইলাহ (উপাস্য) কে? এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের তাৎপর্য কী? দুনিয়ার জীবনে তাদের কী কী দায়িত্ব আছে? কে তাদের ওপর দায়িত্বশীল? কোন পদ্ধতিতে তাদের পরিচালনা করা জরুরি? বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে? মহাজগতে তার অবস্থান কী? এ সবকিছুর পরিচয় জানতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহর মহত্ত্ব, তাঁর ভয় ও প্রভাব মানুষের অন্তরের গভীরে গেঁথে দেয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার পদ্ধতি বাতলে দেয়া।

বর্তমান সময়ে মানুষের আচার-আচরণ-সংশ্লিষ্ট দীনের শাখাগত কিছু বিষয় নিয়েই পড়ে থাকাকে আমি উপযুক্ত মনে করি না। যেমন, ডান হাতে পানি খাওয়া, ধূমপান ত্যাগ করা, বসে পানি খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার দিকে যেতে চাই না। আসলে যে অন্তরের ভিত আকিদাহর ওপর তৈরি হয়নি, ইমানের মহত্ত্বের ওপর যার চরিত্র গঠিত হয়নি, তার পক্ষে এই গুণাবলি বয়ে বেড়ানো এবং সবসময় সেটা মেনে চলা সম্ভব নয়। আমরা মানবাত্মার পরিশুদ্ধি ঠিক সেখান থেকে শুরু করব, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ছিটকে পরা গভীর খাদ থেকে টেনে তুলতে পারি। তারপর আমরা তাকে নিয়ে ওপরে উঠতে থাকব এবং চুমুকে চুমুকে ইমানের সুধাভর্তি পেয়ালা পান করাতে থাকব। আত্মার বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে সমৃদ্ধির চূড়ায় পৌঁছা পর্যন্ত তার সঙ্গ দেবো। সব দাগ ধুয়েমুছে সাফ করে দেবো। এরপর তাকে তার শেকড়ে ফিরিয়ে নেব এবং এখান থেকেই পরিমার্জনের ধারা শুরু করব। যেন ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে এমন দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জন করে, যাকে না কোনো ভূকম্পন ধসাতে পারে, আর না কোনো দুর্যোগ বিচলিত করতে পারে। তারপর আমরা তার কাছ থেকে আল্লাহর যে বিধানই আশা করব, সে তা কল্যাণকর জেনেই সন্তুষ্টচিত্ত, আত্মনিবেদিত ও প্রশান্ত মনে বাস্তবায়ন করবে। কারণ,

আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজের পুরোটাই কল্যাণ আর কল্যাণ। এর বাইরে যত মত পথ রয়েছে, পুরোটাই অকল্যাণকর।

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

'সুতরাং যে আমার পথনির্দেশনা মেনে চলবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না, দুঃখিতও হবে না। আর যে আমার উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত।'[১৯]

পরিশেষে আবারও বলছি, যাঁরা মানুষের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করবেন, তাঁদের এমন গুণের অধিকারী হতে হবে যেন, তাঁরা জমিনে বিচরণ করা জীবন্ত শরিয়াহ। তাঁরা সবসময় আযিমাত (সর্বোত্তম) গ্রহণ করবেন। তাঁরা এমন এক স্বচ্ছ আয়না হবেন, যার মাঝে এই দ্বীনসহ দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে। যে দ্বীনের প্রতি তাঁরা আহ্বান করবেন এবং যে মানহাজ গ্রহণ করানোর জন্য জোরালো ভূমিকা রাখবেন, সেটিই যেন তাঁদের রক্ত-মাংসে পরিণত হয়ে যায়।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'এটি মানুষের প্রতি একটি বার্তা, যেন তারা সতর্ক হতে পারে এবং জেনে নিতে পারে তিনিই একমাত্র ইলাহ; আর যেন জ্ঞানী সম্প্রদায় উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'[২০]

---

[১৯] সূরা ত্বা-হা, ২০ : ১২৩-১২৪

[২০] সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৫২

প্রথম অধ্যায়

আকিদাহ ও তাওহিদ পরিচিতি

আকিদাহ কী

আকিদাহ বলতে ইমানের ছয়টি রুকনের (ভিত্তি) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বোঝায়। আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইমান কাকে বলে?' তিনি বলেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ،

'আল্লাহ, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব, তাঁর সাক্ষাৎ, রাসুল, পুনরুত্থান ও তাকদির—এ সবগুলোর প্রতি তুমি ইমান আনবে।'[১১]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাসূত্রে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু[১২] সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন—আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

'তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব, রাসুল ও আখিরাত দিবস

[১১] সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং : ৭

[১২] মারফু বলা হয় ওইসব কথা, কাজ ও সমর্থনকে, যা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। চাই তা সহিহ হোক বা দয়িফ। [নিরীক্ষক]

এবং তাকদিরের ভালোমন্দের ওপর ইমান আনবে।'[২৩]

আভিধানিকভাবে عقيدة (আকিদাতুন) শব্দটি فعيلة (ফায়িলাতুন) শব্দের ওজনে এসেছে। তবে এখানে معقودة (মাকুদাতুন) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এটা عقد (আকদ) ধাতুমূল থেকে নির্গত; যার অর্থ রশি বাঁধা, কেনাবেচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করা। يعقده (ইয়াকিদুহু) অর্থাৎ তাকে বাঁধা, সন্ধিচুক্তিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করা। অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তিকেও 'আকদ' বলে।[২৪] অতএব, আকিদাহ নামকরণের কারণ হলো, কেমন যেন আকিদাহ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি অঙ্গীকারনামা ও সুদৃঢ় হাতল। এই আকিদাহ মানুষের অন্তরে গেঁথে যায় এবং বিশ্বাসের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়।

প্রথম রুকন : শাহাদাতান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল)—এ দুটো বাক্য এতই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি, যার ওপর এই দ্বীন সুস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর এটি এমন অনন্য পথ, যা প্রতিটি পথ অনুসন্ধানীকে দারুস সালামে (জান্নাত) পৌঁছে দেয়।

يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান, নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'[২৫]

এই মূলনীতি—তাওহিদুল উলুহিয়াহ[২৬]—সব মূলনীতির ভিত্তি; বরং এটি সেই সুদৃঢ় ভিত্তি, যার ওপর আল্লাহর নাযিলকৃত সকল নবির দ্বীন প্রতিষ্ঠিত।

---

[২৩] সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং : ১

[২৪] আল-কামুসুল মুহিত, আইন (العين) অধ্যায় : ১/৫১৩

[২৫] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১৬

[২৬] উলুহিয়াহ শব্দটি এসেছে ইলাহ (إله) থেকে। ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য বা মাবুদ। তাওহিদুল উলুহিয়াহর অপর নাম তাওহিদুল ইবাদাহ। তাওহিদুল উলুহিয়াহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ব বজায় রাখা। যেমন, সালাত, দুআ, হজ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। [ভাষা-সম্পাদক]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার আগে আমি যত রাসুলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি আমি এ ওহিই করেছি—আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।'[২৭]

এক

এই মূলনীতি—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)—ঘোষণা করে, এই মহাজগৎ এক অদ্বিতীয় ইলাহেরই ইচ্ছার প্রকাশ। তাঁর নির্দেশেই গোটা জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাঁর কুদরতেই পৃথিবীর সব বিষয় পরিচালিত হয়। তাঁর হাতেই প্রতিটা সৃষ্টির প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়, কোনো বস্তুই তাঁর অভিলাষ থেকে পালাতে সক্ষম নয়।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'মুসা বলল—আমার রব তো সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দিয়েছেন, তারপর দেখিয়েছেন পথনির্দেশনা।'[২৮]

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

'তোমার সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবকিছু সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন; যিনি সুপরিমিত করেছেন আর পথ দেখিয়েছেন।'[২৯]

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

'মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ ও তাদের (মানুষের) এবং তারা যার কথা জানে না, তাদেরও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।'[৩০]

জগতের প্রতিটি বস্তুই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি—এই সূক্ষ্ম সূত্র যেন কোনোভাবেই আমাদের অন্তর থেকে বিস্মৃত হয়ে না-যায়।

---

[২৭] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৫

[২৮] সুরা ত্বা-হা, ২০ : ৫০

[২৯] সুরা আল-আলা, ৮৭ : ১-৩

[৩০] সুরা ইয়া-সিন, ৩৬ : ৩৬

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

'যিনি প্রত্যেকটি জিনিস চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর মানবসৃষ্টি শুরু করেছেন মাটি থেকে।'[৩১]

দুই

এই মহাজাগতিক প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর সৈন্য। আদেশ করা হলে পালন করে, আহ্বান করা হলে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমান-জমিনে যা কিছু আছে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।'[৩২]

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

'এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধোঁয়া। তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন—তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল—আমরা অনুগত হয়ে এলাম।'[৩৩]

আসমান-জমিন এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই মহান রবের অনুগত সৈন্যদল।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

'আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মালিকানাধীন। সবই তাঁর অনুগত।'[৩৪]

অর্থাৎ রবের অনুগত ও তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত,

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

---

[৩১] সূরা আস-সাজদাহ, ৩২ : ৭

[৩২] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৩

[৩৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১

[৩৪] সূরা আর-রুম, ৩০ : ২৬

'আসমান-জমিনের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[৩৫]

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনার ভাষা বুঝতে পারো না।'[৩৬]

পাহাড়-পর্বত, জলরাশি, আসমান-জমিন সব আল্লাহরই সৃষ্টি। আর এ সবই তাঁর সৈন্যদল,

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'আসমান-জমিনের বাহিনীগুলো আল্লাহরই। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'[৩৭]

তাই তো আল্লাহ আগুনকে আদেশ দেয়া মাত্র সে নির্দেশ পালন করল,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

'আমি বললাম—হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও।'[৩৮]

যখন পর্বতমালাকে ডাক দিলেন তৎক্ষণাৎ সে সাড়া দিলো,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

'আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে মিলে আমার মহিমা বর্ণনা করো। আর হে পাখিরা, তোমরাও। আমি তার জন্য লোহাও নরম করে দিয়েছিলাম।'[৩৯]

তিন

আল্লাহ তাঁর কিছু সৃষ্টিকে কিছু বান্দার অনুগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ

---

[৩৫] সূরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১

[৩৬] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৪৪

[৩৭] সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ৪

[৩৮] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৬৯

[৩৯] সূরা সাবা, ৩৪: ১০

مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

'আর আমি সুলাইমানের জন্য বাতাসকে আজ্ঞানুবর্তী করে দিয়েছিলাম। যার সকাল একমাস, আর বিকেল একমাস।[৪০] আমি তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আর আমি জিনদের তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা রবের আদেশে তার অধীনে কাজ করত। তাদের মাঝে কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব। সুলাইমান যা চাইত, জিনেরা তার জন্য তা-ই তৈরি করে দিত। যার মাঝে আছে বড় বড় প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজের মতো বড় বড় গামলা ও মজবুত ডেগ।'[৪১]

আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন,

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

'"তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো।" ফলে পাথর ফেটে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে লাগল।'[৪২]

চার

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির জন্য রয়েছে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ (জীবনপদ্ধতি)। এর ওপর তারা চলে। তারা সেই নীতি থেকে এক আঙুল তো দূরে থাক, এক চুল পরিমাণও বের হতে পারে না। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সে তার নির্দিষ্ট কক্ষরেখা থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হতে সক্ষম নয়। এ কক্ষপথে আবর্তন করতে সে নির্দেশপ্রাপ্ত। যদি সেই রেখা থেকে বিন্দুপরিমাণও আগ বেড়ে যায়, সে নিজে তো ধ্বংস হবেই, সাথে বহু কিছু বিনাশ করে দিয়ে যাবে। চাঁদ ও পৃথিবীরও রয়েছে নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি। জিন ও মানুষ ছাড়া এই মহাবিশ্বের সব সৃষ্টির জন্য এটিই আল্লাহর কার্যবিধান।

মহা-হুকুমদাতার ইচ্ছায় কখনো কখনো মাখলুকের এসব ইবাদতপদ্ধতির বিভিন্ন রহস্যময় দৃশ্য কিছু বান্দার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৪০] সকাল-বিকেল মিলে তিনি দিনে দুমাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন। [ভাষা-সম্পাদক]

[৪১] সূরা সাবা, ৩৪ : ১২-১৩

[৪২] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৬০

«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»

'আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যেটি আমার প্রেরিত হওয়ার আগে থেকেই আমাকে সালাম পাঠাত (নবি হিসেবে)। আমি এখনো সেটাকে জানি।'[৪৩]

তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগব্যথায় খেজুর গাছের খুঁটির আকাঙ্ক্ষার (কান্না) হাদিসগুলো[৪৪] তো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির।[৪৫] এ ধরনের সৃষ্টির উবুদিয়াত (দাসত্ব) কখনো কখনো নবি ছাড়াও অন্যান্য মানুষের সামনে আল্লাহ প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর নেককার বান্দাদের সামনে ওগুলো দ্যুতিময় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

এ ধরনের আরও একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একবার আলা ইবনুল হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাহরাইনে পাঠালেন। তো মরুভূমিতে সফর করতে করতে তাঁরা তীব্র পানি পিপাসায় পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে মৃত্যুর ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি এক জায়গায় নেমে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে দুআ করেন—ইয়া হালিম (অতি সহনশীল), ইয়া আলিম (সর্বজ্ঞাত), ইয়া আলিইয়ু (সর্বসমুন্নত), ইয়া আযিম (সর্বসম্মানিত), আপনি আমাদের পিপাসা নিবারণ করে দিন। অমনি পাখির ডানার মতো একখণ্ড মেঘ দেখা দেয়। ঝরঝর করে মুষলধারে বৃষ্টি নামতে শুরু করে। তাঁরা সব পাত্র-পেয়ালা ভরে জন্তু-জানোয়ারগুলোকেও তৃপ্ত করালেন। তিনি বলেন, 'তারপর আমরা সফর করতে করতে "দারাইন" গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের ও মুরতাদ বাহিনীর মাঝে একটি সমুদ্র ছিল।'[৪৬]

---

[৪৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৬০৭৮

[৪৪] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এমন একটি খুঁটি (খেজুর গাছের) ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন। তাঁর জন্য মিম্বর স্থাপন করা হলে আমরা খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটির ওপর হাত রাখলেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৯১৮) [ভাষা-সম্পাদক]

[৪৫] মুতাওয়াতির হলো সেই বর্ণনা, যার সনদের প্রতিটি স্তরে এত পরিমাণ রাবি (বর্ণনাকারী) থাকেন, যাদের সবার একটা মিথ্যার ওপর একত্র হওয়া অসম্ভব। সাধারণত বর্ণনাকারীর সংখ্যা দশ বা দশের অধিক হলেই তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[৪৬] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা : ১৪০, বর্ণনা নং : ৯৫১; সনদ দায়িফ। এ সংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনাগুলোও দায়িফ—ইমাম তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির, হাদিস নং : ১৯৯; আল-মুজামুল কাবির, হাদিস নং : ১৬৮; ইমাম বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ : ৬/৫৩; আল-মুজামুল কাবির, হাদিস নং : ১৬৭; ইমাম মিযযি, তাহযিবুল কামাল, রাবি নং : ২১৩৪। কিন্তু

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা এমন এক সমুদ্রতীরে আসলাম, আমাদের আগে কেউ তা পার হয়নি আর আমাদের পরও কেউ পেরোবে না। আমরা সেখানে কোনো নৌযান পেলাম না। নৌযান তো মুরতাদরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল।' তারপর তিনি দুই রাকাআত সালাত পড়ে দুআ করলেন—ইয়া হালিম (অতি সহনশীল), ইয়া আলিম (সর্বজ্ঞাত), ইয়া আলিইয়ু (সর্বসমুন্নত), ইয়া আযিম (সর্বসম্মানিত), আপনি আমাদের সমুদ্র পার করে দিন। এরপর তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন—প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা সমুদ্র পেরিয়ে যাও।

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তারপর আমরা পানির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সমুদ্র পার হয়ে গেলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের কারও পায়ে একটুও পানি লাগেনি, কারও মোজা সামান্যও ভেজেনি, কারও ঘোড়ার খুরে একটু পানিও স্পর্শ করেনি, অথচ সৈন্যসংখ্যা ছিল চারহাজার।'[৪৭]

দ্বিতীয় রুকন : মালাক

মালাকদের[৪৮] প্রতি ইমান স্থাপন করা আমাদের আকিদাহর অন্যতম অংশ। কুরআন আমাদের বলে, মালাকরা আমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বান্দাদের আমলের হিসাব আমলনামায় লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

'প্রত্যেক মানুষের জন্যই আছে একজন তত্ত্বাবধায়ক।'[৪৯]

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সবগুলোর শেষের বিবরণ প্রায় একই। অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দেয়া এবং বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া। এটা ভিন্ন ভিন্ন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এর দুর্বলতা কিছুটা হালকা হয়ে গেছে। পাশাপাশি একটি হাসান সনদে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যিয়াদ ইবনু হুদাইর বলেছেন, 'আমি আলা ইবনু হাদরামিকে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর মামার কাছে বর্ণনা করছেন যে, তিনি যখন সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন তাঁর দুআ ছিল—আল্লাহুম্মা ইয়া হালিম, ইয়া আলিইয়ু ইয়া আযিম।' (মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, হাদিস নং : ৩১৭৯১)। এর সনদ হাসান। তাই, মূল ঘটনাটি অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দেয়া এবং বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া প্রমাণিত সাব্যস্ত হয়। [নিরীক্ষক]

[৪৭] শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ : ৯/১৬১-১৬২; আল-মুজামুল কাবির, হাদিস নং : ১৬৭; এর সনদ দয়িফ। [নিরীক্ষক]

[৪৮] প্রচলিত শব্দ ফেরেশতা। একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ। [ভাষা-সম্পাদক]

[৪৯] সুরা আত-তারিক, ৮৬ : ৪

'সে যে কথাই উচ্চারণ করুক তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছেই রয়েছে একজন তৎপর প্রহরী।'[২০]

سَوَاءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

'তোমাদের মাঝে যে কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে অবাধে বিচরণ করে, তাঁর কাছে সবই সমান। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একেরপর এক আগমনকারী মালাক। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে পাহারা দিয়ে রাখে।'[২১]

মালাকরা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁরা মানুষের কৃতকর্মের হিসাব সংরক্ষণ করেন। তাদের আমলনামা বিশ্বজগতের রবের কাছে সোপর্দ করেন। কিছু মালাক রুহ কবযের দায়িত্বে রয়েছেন। কিছু মালাক মুমিন বান্দাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার (ইসতিগফার) আমলে মশগুল। কিছু মালাক যিকর, রহমত ও তিলাওয়াতের বারাকাহপূর্ণ মজলিসে হাযির থাকেন। এগুলো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দুজন তত্ত্বাবধায়ক মালাক প্রত্যেক মানুষের সাথে সবসময় ঘুরে বেড়ান। মানুষ যেখানেই থাকুক, যেখানেই পরিভ্রমণ করুক, প্রস্রাব-পায়খানার মতো কিছু জায়গা ছাড়া তাঁরা কখনো বিচ্ছিন্ন হন না।[২২]

তৃতীয় রুকন : আসমানি গ্রন্থ

আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও আকিদাহর অন্যতম অংশ। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফা, সাইয়িদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত তাওরাত, ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত ইনজিল এবং আমাদের নেতা নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত কুরআনে ওপর ঈমান আনা। তবে এখানে দুটো বিষয়ের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে,

[২০] সূরা কাফ, ৫০ : ১৮

[২১] সূরা আর-রাদ, ১৩ : ১০-১১

[২২] প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দ সকল কাজ সংরক্ষণের জন্য তাদের সাথে নিয়োজিত দুজন মালাক রয়েছেন। কুরআন তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে 'রাকিব' ও 'আতিদ' বলে। তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হন মর্মে সহিহ কোনো বর্ণনা নেই। যদিও কিছু হাদিসে ভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হন বলে উল্লেখ রয়েছে, তবে সেগুলোও যয়িফ। [নিরীক্ষক]

এক

আমরা বিশ্বাস করি এই পবিত্র গ্রন্থাবলি মৌলিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের দিকে মানুষের কলঙ্কিত হাত প্রসারিত হয়েছে। কখনো তারা কিতাব নিয়ে উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠত, কখনো তা বিকৃতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, কখনো বা অসংযত ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে, কখনো তারা আবার কিতাবের হুকুমই পাল্টে দিয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবধারী সম্পর্কে কুরআন আমাদের এমনই সংবাদ দেয়,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

'যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণের জন্য বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে", তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য রয়েছে শাস্তি। আর তারা যা উপার্জন করেছে, তার জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[৫৩]

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তাদের একদল লোক আছে, যারা কিতাব পড়ার সময় জিহ্বা বাঁকা করে, যাতে তোমরা তাকে কিতাবের অংশ মনে করো; অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে" অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা জেনেশুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে।'[৫৪]

এই কুরআনে কোনো মিথ্যা ও ভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না। কুরআন আমাদের সংবাদ দেয়, আহলুল কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান) আল্লাহপ্রেরিত সকল গ্রন্থের সাথে উন্মত্ত খেলায় মেতেছিল। একমাত্র এই কুরআন ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহপ্রেরিত এমন কোনো কিতাব নেই, যার প্রতিটি অক্ষর ও বাক্য প্রকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট রয়েছে।[৫৫]

---

[৫৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৭৯

[৫৪] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৭৮

[৫৫] কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা। যা হরফ, অর্থ ও আওয়াজের সমষ্টির নাম। আহলুস সুন্নাহর আকিদাহমতে কালামুল্লাহ আল্লাহর সিফাত। হরফ, অর্থ ও আওয়াজের সমন্বয়ে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং জিবরিল (আলাইহিস সালাম) হুবহু সেটিই নিয়ে এসেছেন। [নিরীক্ষক]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই নাযিল করেছি উপদেশবার্তা (কুরআন), আমিই একে হিফাযাত করব।'[৫৬]

দুই

কুরআনই মানবজাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত সর্বশেষ মানহাজ (পথ-পদ্ধতি)। এটিই সর্বশেষ বিষয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ কিয়ামাত-দিবসে মানবজাতিকে প্রশ্ন করবেন। আগেকার সমস্ত আসমানি গ্রন্থের রহিতকারী ও সংরক্ষক হিসেবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

'আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা তার আগের কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।'[৫৭]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

'তিনিই তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত বাতিল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'[৫৮]

এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গৃহীত হবে না। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের হিসেব গ্রহণ করা হবে না।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করলে কখনোই তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[৫৯]

---

[৫৬] সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৯

[৫৭] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৮

[৫৮] সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৮

[৫৯] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৫

চতুর্থ রুকন : নবি-রাসুল

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সমস্ত নবি-রাসুলের ওপর ইমান আনা ইসলামি আকিদাহর অন্যতম অংশ। কেউ কোনো রাসুলের রিসালাত অস্বীকার করলে দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ এসব ব্যক্তির কোনো দান-সাদাকাহ ও আমল-ইবাদত কবুল করবেন না।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'রাসুলের প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তিনি তার প্রতি ইমান এনেছেন, ইমানদারেরাও এনেছে। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসুলদের প্রতি ইমান এনেছে। আর তারা বলে—আমরা তাঁর রাসুলদের মাঝে পার্থক্য করি না। তারা আরও বলে, "আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। ও রব, আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করি তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"'[৬০]

রাসুলকে অস্বীকার করা মূলত সকল রিসালাতকে অস্বীকার করার সাথে সাথে কুরআনকেও অস্বীকার করা। কুরআনই রাসুলদের নাম অকাট্য দলিল-প্রমাণে স্পষ্ট করেছে।

পঞ্চম রুকন : আখিরাত

আখিরাতের প্রতি ইমান রাখাও দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি। এটি বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে আগত সকল দ্বীনের ভিত্তিপ্রস্তর।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে, আর যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান বা সাবিয়িনের মধ্য থেকে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের ভয় নেই, তারা

[৬০] সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৮৫

নিশ্চিতও হবে না।'[৬১]

আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান এবং নেক আমল—উল্লিখিত তিন রুকনই মূলত আল্লাহ নাযিলকৃত সকল দ্বীনের ভিত্তিমূল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের কথা হলো, এই দুনিয়া আখিরাতের সেতু আর গোটা মানবজাতিকে অনেকগুলো পর্ব ও গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যেমন, মাতৃজঠর থেকে শুরু করে পৃথিবীতে আগমন, সেখান থেকে কবর পর্যন্ত। তারপর পুনরুত্থান, হাশর, মিযান, পুলসিরাত। তারপর সেখান থেকে হয়তো অভিশপ্তদের স্থান জাহান্নামে, নয়তো মহান মালিকের কাছে যথাযোগ্য চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে।

সত্য কথা হলো আখিরাতের প্রতি ইমানই দুনিয়ার জীবনে সকল নিরাপত্তার উৎস। এটি এমন এক মজবুত নীতিমালা, যা মানুষের চরিত্রকে রক্ষা করে। এমন এক বিশ্বস্ত পাহারাদার, যা পৃথিবীতে আল্লাহর শরিয়াত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। চোখের দৃষ্টিকে হারাম বস্তুর দিকে যেতে নিষেধ করে। খারাপ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা-কল্পনা করতে নাফসকে বারণ করে। আল্লাহ পছন্দ করেন না, এমন একটা শব্দও উচ্চারণ না-করতে মুখকে বাধ্য করে। লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এগুলোর প্রত্যেকটিই। মানুষের প্রতিটি শ্বাস-নিশ্বাস, শব্দ এমনকি প্রতিটি নড়াচড়াও আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿﴾

'আমি প্রত্যেক মানুষের আমল তার গলায় বেঁধে রেখেছি। কিয়ামাতের দিন তার সামনে পেশ করব একটি কিতাব (লিখিত বিবরণ), যা থাকবে উন্মুক্ত। তাকে বলা হবে, পড়ো তোমার কিতাব। আজ তোমার বিরুদ্ধে হিসাবগ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।'[৬২]

ষষ্ঠ রুকন : ভাগ্য

কদরের ('ভাগ্য') প্রতি ইমান মানবাত্মার মৌলিক চালিকাশক্তি। এটি জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আমলের প্রকৃত হিফাযাতকারী। কদরসংক্রান্ত নস (কুরআন-হাদিস) থেকে সর্বপ্রথম আমাদের অন্তরে দুটো বিষয় জেগে ওঠে—রিযক ও মৃত্যু। আমি এ বইয়ের

[৬১] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৬২

[৬২] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১৩ ১৪

একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি, আমরা ইমান রাখি মানুষের কদর (ভাগ্য) প্রমাণিত ও সুনির্ধারিত। কোনো ব্যক্তি তার পূর্ণ রিযক গ্রহণ না-করে এবং হায়াত পরিপূর্ণ না-করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় না। কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময় ছাড়া মৃত্যুবরণ করে না। কেউই নিজের রিযক থেকে বিন্দুপরিমাণ হ্রাস করতে পারে না, চাই তার ক্ষমতা ও দাপট যতই বিস্তৃত ও প্রসারিত হোক না কেন।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তাহলে কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি সব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।'[৬৩]

মনে রাখবেন সমগ্র দুনিয়াবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার উপকার করতে চেষ্টা করলেও তারা তা পারবে না। আল্লাহ যতটুকু নির্ধারণ করেছেন, ততটুকুই পারবে। আবার দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে আপনার ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লেগে গেলেও তারা সক্ষম হবে না। অতটুকুই পারবে, যতটুকু আল্লাহ লিখে রেখেছেন। তাকদিরের কলম উঠে গেছে এবং খাতা শুকিয়ে গেছে।[৬৪]

হায়াতও সুনির্ধারিত, রিযকও সুনির্ধারিত। সেই সাথে আমরা দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করি, সকল বস্তুর রাজত্ব আল্লাহরই হাতে। সব বিষয়ই তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আসমান-জমিন সব সৃষ্টিই তাঁর পদানত, সব বিষয় তাঁর দিকেই ফিরে যায়। পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে পেছনে রেখে আসা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে এই বিষয়গুলো প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সে তো একমাত্র আল্লাহকেই পরিবারের ভরণপোষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে যায়।

উদাহরণ হিসেবে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই যথেষ্ট। তাবুক যুদ্ধে তিনি রাসুল্লাল্লাহু

---

[৬৩] সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৭

[৬৪] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ছাড়া আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।' (সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ২৫১৬; সহিহ) [ভাষা-সম্পাদক]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সব অর্থকড়ি এনে জমা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?' তিনি উত্তর দিলেন—পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।[৬৫]

এই তো আমরা দেখতে পাই, জিহাদ-কিতালের আয়াত আকিদাহ-সম্পর্কিত আয়াতের পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত ওইসব আয়াতের মাঝে আলোচিত হয়েছে, যেগুলোর মূল ভাষা হলো, জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহরই হাতে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ মরতে পারে না। মৃত্যু হয় নির্ধারিত সময়েই।'[৬৬]

যার হৃদয়ের গভীরে এই আকিদাহ গেঁথে যায়, সে আত্মিকভাবে এমন শক্তিশালী হয় যে, কখনো নত হয় না। পৃথিবীর কোনো শক্তির মুখোমুখি হয়েও ভয় পায় না। দুনিয়ার কোনো সম্রাটের ক্ষমতার সামনে নমনীয় হয় না বিন্দুপরিমাণও। লোভনীয় সম্পদ ও প্রাচুর্যের হাতছানিতেও সে প্রলুব্ধ হয় না। এই আকিদাহই মানুষকে কর্দমাক্ত নর্দমা থেকে মর্যাদার সুউচ্চে তুলে ধরে। তখন সে এমন এক সুউচ্চ স্থানে থাকে, যেখান থেকে বিনয়ী হয়ে গোটা পৃথিবীর ওপর চোখ বোলাতে পারে। তার ভেতরে জন্ম নেয় আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু ভালোবাসা ও পারস্পরিক হৃদ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। লোপ পেতে থাকে সীমালঙ্ঘন ও মানুষের প্রতি অন্যায়। তখন সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে, আল্লাহ তাকে যে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, অন্যদেরকেও যেন সেই মর্যাদায় আরোহণ করান।

এই আকিদাহর কারণেই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম—সাহাবা কিরাম—আত্মিকভাবে আখিরাতে বাস করতেন, যদিও তাঁদের দেহ দুনিয়ার জীবনে ঘুরে বেড়াত। যদিও তাঁরা কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে হেঁটে চলতেন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি জান্নাতের ভেতর এবং

---

[৬৫] উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাদাকাহ করার হুকুম করেন (তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে)। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় আমার সম্পদও ছিল। আমি মনে মনে বললাম—যদি আমি কোনোদিন আবু বাকরকে ডিঙাতে পারি, তাহলে আজই সেই সুযোগ। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কি বাকি রেখে এসেছ?" আমি বললাম—এর সমপরিমাণ। আর আবু বাকর তাঁর সমস্ত মাল নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, "হে আবু বাকর, তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কী বাকি রেখে এসেছ?" তিনি বললেন—তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকেই রেখে এসেছি। আমি মনে মনে বললাম—আমি কখনো কোনো প্রসঙ্গেই আবু বাকরকে ডিঙাতে পারব না।' (সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬৭৫; হাদিসটি হাসান) [ভাষা-সম্পাদক]

[৬৬] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৫

আখিরাতের হিসাব-নিকাশের প্রতি উঁকি দিত। তাঁরা জমিনে চলাফেরা করতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের চালচলনে কুরআনের দ্যুতিই প্রতিফলিত হতো। চলুন, আমরা হিজরি তৃতীয় শতকের এক কীর্তিমান পুরুষের কথা শুনি। আমরা জানব কীভাবে তিনি এই আকিদাহ ধারণ করতেন। চলুন, ইমাম আহমাদের কাছ থেকেই শুনে আসি। একবার এক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এসে বলল—আমাকে কিছু নাসিহাহ করুন। তিনি বললেন, 'যদি তুমি বিশ্বাস করো আল্লাহই তোমার রিযকের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাহলে রিযকের জন্য এত দুশ্চিন্তা কীসের? যদি জাহান্নাম সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এত গুনাহপ্রবণ কেন? যদি দুনিয়া নশ্বরই হয়ে থাকে, তাহলে এখানে আত্মতৃপ্ত কেন? হিসাবনিকাশ সত্যই হয়ে থাকলে সম্পদ সঞ্চয়ের এত প্রবণতা কেন? সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে কাযা (ফায়সালা) ও কদরের (ভাগ্য) কারণে হলে এত ভয় কেন? যদি মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন সত্যই হয়, তাহলে অন্যের প্রতি এত টান কেন?' তারপর লোকটি ইমাম আহমাদের কাছ থেকে বের হয়ে গিয়ে মনে মনে শপথ করল, সে সবসময় আল্লাহর কাযা (ফায়সালা) ও কদরের (ভাগ্য) ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।[৬৭]

[৬৭] আল-মাদখাল : ৩/৩৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদাহগত বিকৃতি : মানবজাতির বিপর্যয়

আকিদাহর বাস্তবতা

আকিদাহ নিয়ে আমরা সামনে যত দীর্ঘ আলোচনা করব, সেখানে কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা থাকবে। এগুলো আমাদের অন্তর থেকে কোনোভাবেই যেন হারিয়ে না-যায় :

১. এই আকিদাহ আল্লাহপ্রদত্ত। এটি মানবজাতির জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত সর্বশেষ মানহাজ।

২. পুরো শরিয়াহ এই আকিদাহর ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটিই মানবজাতিকে দ্বীনি কল্যাণের পথ দেখাবে।

৩. একমাত্র এই আকিদাহই মানবজীবনে আত্মিক ও দৈহিক বিধানের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আসমান ও জমিনের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে এবং দ্বীনি বিধিনিয়মে ইবাদত ও আমলের মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। উসতায সাইয়িদ কুতুব[৬৮] 'আল-আদালাতুল ইজতিমায়িয়াহ' গ্রন্থে এভাবেই আলোচনা করেছেন।

---

[৬৮] সাইয়িদ ইবরাহিম হুসাইন কুতুব [৯ অক্টোবর, ১৯০৬—২৯ আগস্ট, ১৯৬৬] : মিশরীয় আলিম, সাহিত্যিক ও দায়ি। প্রথম জীবনে ছিলেন সংস্কৃতিমনা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনুগামী হয়েই চলেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ইখওয়ানুল মুসলিমে প্রবেশ করেন। এ পর্যায়ে এসে সাইয়িদ কুতুব এমন রচনাও করেন, যা আহলুস সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে সাহাবা কিরামের ব্যাপারে। একপর্যায়ে তিনি ইখওয়ানের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে ইসলামের আদি ও সঠিক বয়ান পেশ করতে থাকেন। তাঁর চিন্তাভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মানহাজের সাথে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লিখেন 'মাআলিম ফিত-ত্বরিক'। মূলত এ বইয়ের জন্যই তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর আগের সেই বিতর্কিত বইয়ের আপত্তিজনক অংশ সরিয়ে দেন। ১৯৬৬ সালে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। রাহিমাহুল্লাহ। (অবশ্য দেখুন : সাইয়িদ কুতুব, ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি (লেখক পরিচিতি অংশ), সংকলন প্রকাশন প্রকাশিত)। [ভাষা-সম্পাদক]

৪. মানুষের সব আমল ও আচরণ আকিদাহরই প্রতিফলন। আকিদাহই এগুলোর ভিত্তি।

৫. আকিদাহর সাথে সম্পর্কহীন আমলের কোনো মূল্যই নেই।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

'যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে তাদের উদাহরণ হলো, তাদের আমলগুলো যেন ছাইয়ের স্তূপের মতো, যার ওপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায়। তারা নিজ উপার্জন দিয়ে কিছুই করতে পারে না। এটাই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।'[৬৯]

দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তিকামীদের জন্য, সৌভাগ্য, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রশান্তির পিছুছোটা লোকদের জন্য এই পাঁচটি বিষয় আলোর মিনার হয়ে থাকবে।

আকিদাহর গুরুত্ব

আল্লাহ কুরআনের বড় একটি জায়গা স্বতন্ত্রভাবে এই আকিদাহর জন্য নির্ধারণ করেছেন, এর জন্য দীর্ঘ সময় দিয়েছেন, যেন এই আকিদা হৃদয়ের গভীরে ভালোভাবে বদ্ধমূল হতে পারে। মাক্কি জীবনের প্রায় পুরোটা অংশজুড়েই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোনো আয়াতের অবতারণা করা হয়নি। কেবল এ বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, আকিদাহর মাধ্যমে অন্তর গঠনের ধারাটি ধীর ও শ্রমসাধ্য। কখনো কখনো এ কাজ করার জন্য এমন এক বিশাল পরিব্যপ্ত সময়ের প্রয়োজন পড়ে, যে সময়ে একটি মানবদেহ বেড়ে ওঠে।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

'আমি কুরআনকে ভাগ ভাগ করে অবতীর্ণ করেছি, যেন তা বিরতিসহ মানুষের সামনে পড়তে পারো। আর আমি তা ধাপে ধাপে নাযিল করেছি।'[৭০]

পৃথক অনুশীলন ও দীর্ঘ সময়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে শরিয়াতের সব বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য আকিদাহ হৃদয়ের গভীরে ভালোভাবে গেঁথে যাওয়াও অপরিহার্য। আর এ কারণেই মদিনায় সাহাবা কিরামের অন্তরে আকিদাহ দৃঢ়ভাবে গেঁথে না-যাওয়া পর্যন্ত

[৬৯] সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৮

[৭০] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১০৬

শরয়ি বিধান অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হয়। আর আল্লাহ তো সাহাবা কিরামকে নিজ দ্বীনের পর্দা বানিয়েছেন, তাঁদের হাতেই এই দ্বীনের বিজয় দিয়েছেন।

উসতায আবুল হাসান আলি নাদবি[৭১] তাঁর ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলিমদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো)[৭২] কিতাবের 'ইনহাল্লাতিল উকদাতুল কুবরা (বড় গিঁট খুলে গেল)' নামক শিরোনামে লিখেছেন,

> 'এরপর সেই বৃহৎ গিঁটটা নিমিষেই খুলে গেল, অর্থাৎ শিরকি ও কুফরি আকিদাহর গিঁট। সাথে সাথে অন্যান্য সবগুলো গিঁটও খুলে যায়। তাঁদের পেছনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা জিহাদ করার প্রথমবারেই করেছেন। এরপর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের জন্য নতুন করে আর জিহাদের প্রয়োজন পড়েনি। জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই ইসলামের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর থেকে সবকটি যুদ্ধময়দানে বিজয় ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে পুরোনো মদের পেয়ালাগুলো তাঁদের আঙুলের ডগায় শোভা পাচ্ছিল। কিন্তু কুরআনের আয়াত মদের পেয়ালা এবং মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ঠোঁট আর উত্তেজিত হৃদয়ের মাঝে পর্দা টেনে দেয়। মদের বড় বড় শরাবদানিগুলো যখন ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, পুরো মদিনার অলিগলি পথঘাট ভেসে যায়।'[৭৩]

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (তোমরা মদপান থেকে বিরত হবে না?)[৭৪]—এই একটি মাত্র বাক্য তাঁদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে চলা আদি স্বভাবকে নিমিষেই উৎপাটন

---

[৭১] সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদবি [৫ ডিসেম্বর, ১৯১৩—৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯] : ভারতীয় আলিম, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও দায়ি। তাঁর প্রভাব ও খ্যাতি উপমহাদেশ ছাড়িয়ে আরবেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলর ও সিন্ডিকেট সদস্য। এ ছাড়াও তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকও ছিলেন। 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন' বইটিই তাঁকে আরববিশ্বে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৮০ সালে কিং ফায়সাল পুরস্কারও পান তিনি। (সূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

[৭২] আমি গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তাই বলছি, প্রতিটি মানুষেরই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত। আরও ভালো হতো যদি প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই বইটি রাখা হতো। [লেখক]

[৭৩] মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা : ৮৮

[৭৪] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯১

করে ফেলল। তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا—আমরা নিবৃত হলাম, আমরা নিবৃত হলাম। অথচ আমেরিকা এই মদ নিষিদ্ধ করার জন্য অত্যাধুনিক সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টকশো, আলোচনা-পর্যালোচনা, বিভিন্ন চিত্র, এমনকি নাটক-সিনেমা তৈরি করেছিল মদের ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরার জন্য। এর বিরুদ্ধে ষাট মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছিল। প্রায় দশ বিলিয়নের মতো লিফলেট ছাপানো হয়েছিল এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়। এতে তিনশো জন নিহত হয়, অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি গ্রেফতার হয়। চার বিলিয়ন চারশো মিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও আমেরিকানদের মদের প্রতি নেশা আশংকাজনক হারে বাড়তেই থাকে। যার কারণে আমেরিকান প্রশাসন ১৯৩৩ সালে মদকে বৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।[৭৫]

কারণ একটাই, আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আকিদাহ থেকেই উৎসারিত হয়। ঠিক একইভাবে আকিদাহই এই দ্বীনবৃক্ষের শেকড়। যতক্ষণ না এই শেকড় মাটির গভীরে ছড়াবে, এই সুউচ্চ বৃক্ষের ডালপালার ভার সে বইতে পারবে না। তাই তো বিশুদ্ধ আমলের জন্য আবশ্যক হচ্ছে অন্তরের গভীরে থাকা মজবুত ইমান। আকিদাহর দৃষ্টান্ত ওই বিশাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের মতো, যার সুদৃঢ় ভিত এবং মজবুত খুঁটির প্রয়োজন হয়, যেন এর ওপর ভবনটি স্থির হতে পারে। এই বাস্তবতা থেকেই প্রকট হয়ে ওঠা আরও একটি বিষয় হলো—ভবন বানানোর আগে ভিত্তিপ্রস্তর ও উৎসমূলকে মজবুত করে নির্মাণ করা, নয়তো পুরো ভবনটিই ধসে পড়তে পারে।

তাই, যাদের আমরা এই মহান দ্বীনের দিকে আহ্বান করি অথবা যাদেরকে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর গড়ে তুলতে চাই, সবকিছুর আগে ইমানের শিক্ষা দিয়ে শুরু করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত এই প্রজন্মের সন্তানদের হৃদয়ে আকিদাহর বুঝ বিবর্ণ হয়ে গেছে। এর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানহাজ রেখে গেছেন, প্রতিটি ব্যক্তিকে সে মানহাজই অনুসরণ করতে হবে। তারপর তাদের শরিয়াতের ফুরুয়ি (শাখাগত) বিষয়গুলো মানতে বলা হবে। মানুষদের বোঝাতে হবে, তাদের রব কে? মহাবিশ্বে আল্লাহর বড়ত্ব, ক্ষমতা, কেমন ও কতটা অন্তহীন! তিনিই সকল সম্রাটের সম্রাট, তাঁর হাতেই সব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ। তিনিই সব বান্দার ওপর মহানিয়ন্ত্রক। তাঁর দিকেই সব বিষয় ফিরে যায়। তিনিই সর্বস্রষ্টা ও রিযকদাতা। এই বিষয়গুলো প্রথমেই শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যদি প্রথমেই তাদেরকে শরিয়াতের শাখাগত বিষয়গুলো মানতে বলি, তাহলে এটা হবে শূন্যে বীজ অঙ্কুরোদগম

[৭৫] তাফসির ফি যিলালিল কুরআন : ৫/২৭

করার অর্থহীন প্রচেষ্টা। অথচ এখনো তারা সৃষ্টির স্রষ্টাকেই চেনেনি।

এই আকিদাহর গুরুত্ব, এর বিষয়বস্তুর স্পর্শকাতরতা ও মৌলিকতার কারণেই কুরআনে বর্ণিত আকিদাহ-সম্পর্কিত অধিকাংশ আয়াতে দীক্ষাসূচক শব্দ قل (বলুন) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

'বলুন—আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়।'[৭৬]

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ

'বলুন—হে কাফিরেরা।'[৭৭]

قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

'তোমরা বলো, আমরা ইমান আনলাম আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি।'[৭৮]

দর্শন ও কালামশাস্ত্র

দ্বীনি আকিদাহর বৈশিষ্ট্যই এমন যে, তা অন্তরে গেঁথে যায়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তার প্রতি তুষ্ট হয়ে যায়। হৃদয়ের অনুভূতিকে আন্দোলিত করে। জীবনবাস্তবতায় যত আচার-আচরণ আছে, সবকিছুর ওপর তার প্রতিফলন ঘটে। সর্বক্ষেত্রে আকিদাহই মূল চালিকাশক্তি। ইতিহাসের গতিময়তায়, মানবজাতির পরিবর্তনে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। এটি অজ্ঞাত নয় যে, ইসলামি আকিদাহ অবতীর্ণ হওয়া থেকেই মানুষের জীবনে বড় বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর দর্শনশাস্ত্র[৭৯] তো যুক্তিনির্ভর বিলাসিতা মাত্র। এটা মানুষের কল্পনাতেই ঘুরপাক খেতে থাকে। অধিকাংশ সময় তো কেবল মনেই থেকে যায়।

[৭৬] সুরা আল-ইখলাস, ১১২ : ১

[৭৭] সুরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ১

[৭৮] সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৩৬

[৭৯] ইমাম সুয়ুতি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানতিকের (যুক্তিবিদ্যা) মতো ফালসাফা (দর্শন) নিয়ে মত্ত থাকাও হারাম। এটি সালাফ ও বেশিরভাগ গ্রহণযোগ্য মুতাআখখিরিন (পরবর্তী) মুহাক্কিকদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যারা একে স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন, তাদের অন্যতম হলেন ইবনুস সালাহ, নাওয়াবিসহ অসংখ্য উলামা কিরাম। এর হারাম হওয়ার দলিল নিয়ে আমি একটি বই-ও লিখেছি। এমনকি শাফিয়িও সর্বশেষ একে হারাম বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন : মোল্লা আলি কারি, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা : ৪) [লেখক]

এর বিরাট অংশজুড়েই রয়েছে এমন কিছু মতবাদ আর দৃষ্টিভঙ্গি, যা কেবল দার্শনিকদের মাথায়ই ঘুরপাক খায়। এই দর্শনশাস্ত্র মানবজাতিকে একপাও সামনে এগিয়ে নিতে পারেনি। দার্শনিকরা তো কেবল নিজেদের উদ্ভাবিত এই যুক্তির ওপর ভর করেই এর চর্চা করে। এর মাঝে আত্মার অনুভূতিতে কোনো উষ্ণতা নেই, অনুভূতিময় জীবনের হাতছানি নেই, জীবনচলার পথে কোনো রৌশনি নেই।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা তথাকথিত ইসলামি দর্শন অধ্যয়নকারীদের মনে যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে। আর তা হলো, যেভাবে মদের পাত্রে বিশুদ্ধ দুধ রাখা অসম্ভব, ঠিক সেভাবে ইসলামি আকিদাহ মানুষের চিন্তাধারার মাধ্যমে বর্ণিত হওয়াটাও অসম্ভব। এ কারণেই আল্লাহপ্রদত্ত স্বচ্ছ আকিদাহর চিত্র, গঠনপ্রকৃতিকে দর্শনশাস্ত্রের ছাঁচে বিবৃত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এই দর্শন তো আকিদাহর নির্মল আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়। আলোর সঠিক বিচ্ছুরণকে বাধাগ্রস্থ করে। ফলে প্রাণস্পন্দিত ইসলামের আর্দ্রতাপূর্ণ আকিদাহ হয়ে পড়ে শুষ্ক। ইতিবাচক চিন্তাবিশ্বাস থেকে পরিণত হয় নেতিবাচক চিন্তাদর্শনে এবং সহজতার বিপরীতে হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য।[৮০]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশগ্রহণের কেউ আছে কি?'[৮১]

ইসলামের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলিম দর্শনশাস্ত্রের ফিতনায় পড়ে ইলমুল কালাম[৮২]

---

[৮০] ইসলামে গ্রিকদর্শনের আমদানি হয়েছে অনেকটা খামখেয়ালিভাবেই। উমাইয়াদের যুগে ব্যাপক বিজয়ের ফলে আব্বাসি যুগে এসে প্রায় অর্ধবিশ্বজুড়ে মুসলিমশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন মুসলিমরা ব্যাপকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করে। তাদেরই একটা অংশ ইউরোপীয় গ্রিকদর্শনের প্রতি আগ্রহী হয়ে এর চর্চা শুরু করে দেয়। তবে খলিফাহ মামুনের যুগে ভ্রান্ত গোষ্ঠী মুতাযিলাদের মাধ্যমে এটা ব্যাপকতা লাভ করে। ইমাম বাইহাকি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মামুনের আগে উমাইয়া ও আব্বাসি বংশের সকল খলিফাহই সালাফের মাযহাব-মানহাজের ওপর ছিলেন। সে খিলাফাতের দায়িত্ব নিলে সব মুতাযিলি এসে তার কাছে ভ্রান্ত আকিদাহগুলো তুলে ধরে।' (ইমাম ইবনু কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৬) [নিরীক্ষক]

[৮১] সুরা আল-কামার, ৫৪ : ২২, ৩২, ৪০

[৮২] হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে মুসলিমসমাজ এই জ্ঞানের সাথে পরিচিত ছিল না। আবুল ফাতহ আশ-শাহরিস্তানি (মৃত্যু : ৫৪৮ হিজরি) বলেন, 'মামুনের যুগে যখন দর্শনশাস্ত্রের বই-পুস্তকগুলো ব্যাখ্যা করা হয় (অনূদিত হয়), তখন মুতাযিলা শাইখরা এগুলো অধ্যয়ন করে। ফলে তারা নিজেদের মানহাজকে দর্শনশাস্ত্রের মানহাজের সাথে মিশিয়ে ফেলে এবং একে একটা আলাদা জ্ঞানের শাস্ত্রে পরিণত করে। আর তারা এর নাম দেয় কালাম।' (দেখুন : আশ-শাহরিস্তানি, আল-

ও যুক্তিবিদ্যার (মানতিক) ছাঁচে আকিদাহকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আল-গাযালি (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরি), ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি (মৃত্যু : ৪৭৮ হিজরি) ও ফখরুদ্দিন আর-রাযি (মৃত্যু : ৬০৬ হিজরি)। তবে প্রথমবারেই তাঁদের এর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যায়। তাঁদের আত্মবিচ্যুতি প্রায় ঘটেই গিয়েছিল এবং চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা ইলমুল কালাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ইমাম গাযালি (রাহিমাহুল্লাহ) ছোট একটি বই লেখেন। বইটির নাম ছিল 'ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম' (ইলমুল কালাম থেকে সর্বসাধারণকে বিরতকরণ)। তিনি সেই বইয়ে লিখেছেন,

> 'ইলমুল কালাম আমার জন্য যথেষ্ট হয়নি আর আমার সে রোগেরও উপশম হয়নি, যার জন্য আমি কষ্ট করতাম।'

তিনি আরও বলেন, 'সত্য কথা হলো, দুই ব্যক্তি ছাড়া সবার জন্যই ইলমুল কালাম হারাম।'[৮৩]

ইলমুল কালাম চর্চার জন্য আল-জুয়াইনি জীবন সায়াহ্নে অনুতাপের আঙুল কামড়ে ধরে বলতেন,

> 'তোমরা বৃদ্ধদের দ্বীন আঁকড়ে ধরো। তাঁর (আল্লাহ) অনুগ্রহের মাধ্যমে যদি সত্য খুঁজে না-পাই, তাহলে আমি বৃদ্ধদের দ্বীনের ওপর মৃত্যুবরণ করব। মৃত্যুকালে আমার শেষ পরিণাম যদি তিনি কালিমাতুল ইখলাসের মাধ্যমে সমাপ্ত না-করেন, তাহলে দুর্ভোগ ইবনু জুওয়াইনির জন্য।'[৮৪]

ইমাম রাযি (রাহিমাহুল্লাহ) বলতেন,

> 'শেকলই জ্ঞানীদের দুঃসাহসিকতার ইতি
> জগৎবাসীর কর্মতৎপরতার শেষ স্তর ভ্রষ্টতা-ভ্রান্তি।

মিলাল ওয়ান-নিহাল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯)। ইলমুল কালামের সংজ্ঞায় ইবনু খালদুন বলেন,

هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية

'এটা এমন জ্ঞান, ইমান-আকিদাহর ক্ষেত্রে বিবেকপ্রসূত প্রমাণাদির মাধ্যমে যারা বিতর্ক করেন, এটা তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে।' (ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, দশম পরিচ্ছেদ : ইলমুল কালাম)। [নিরীক্ষক]

[৮৩] ফাইসালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামি ওয়ায-যানদাকাহ, তাহকিক : ঈসা তালাবি, পৃষ্ঠা : ১০

[৮৪] ইবনুল জাওযি, তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১৫

এই দীর্ঘ জীবনে গবেষণা করে অর্জন করিনি কিছুই
কেবল জমা করেছি প্রশ্ন আর অভিযোগের স্তূপই।[৮৫]

হ্যাঁ, এই তিনজন পুরুষ ইলমুল কালাম থেকে ফিরে এসেছিলেন।[৮৬] কিন্তু কখন? ইসলামি আকিদাহকে তর্কশাস্ত্র, পৌত্তলিক উপাখ্যান-মিশ্রিত গ্রিকদর্শনে ডোবানোর পর। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিশুদ্ধ আকিদাহ পৌত্তলিকতায় কলুষিত গ্রিক চিন্তাধারার মাধ্যমে কীভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? এটা অসম্ভব।

তা ছাড়া এই ইমামরা উসুলশাস্ত্রেও (উসুলুল ফিকহ) ব্যাপক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা সকল উসুলকে (ফিকহি মূলনীতি) ইলমুল কালাম ও মানতিকের (যুক্তিবিদ্যা) সাহায্যে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে উসুলগুলো আরও জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলেন তাঁরা। মূলনীতিগুলো হয়ে ওঠে শুষ্ক-ঠনঠনে। অথচ সেগুলো ছিল কত সরল, সহজ এবং বোধগম্য! আমার কথায় আপনাদের সন্দেহ হলে ইমাম শাফিয়ির 'আর-রিসালাহ' পড়ুন। দেখুন, বইটির সহজতা ও সরলতা! আপনি যদি একান্তই আগ্রহী হন, তাহলে 'আর-রিসালাহ'র সাথে অন্যান্য বই মিলিয়ে দেখুন। যেমন, সুবকির লেখা 'জামউল জাওয়ামি' ও কামাল ইবনুল হুমামের লেখা 'আত-তাহরির'। আপনি দেখতে পাবেন কত বিশাল পার্থক্য, কেমন দূরত্ব!

আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগে, এখনো এই যুক্তিবিদ্যা ও ইলমুল কালামকে বিশেষভাবে পাঠদান করা হয় আর দলিল দেয়া হয়, এগুলো নাকি উসুল ও আকিদাহর জন্য খুবই জরুরি। আকিদাহ অবশ্যই সহজ-সরল ও অকৃত্রিম। এই আকিদাহ মানুষের সামনে বর্ণনা ও প্রকাশের দায়িত্ব স্বয়ং কুরআনই নিয়েছে। তাই তো মানবচিন্তাপ্রসূত কোনো মাধ্যমে এই আকিদাহ বর্ণিত হওয়া বৈধ নয়।

ইমাম শাফিয়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'কুফর ছাড়া যত কাজ থেকে আল্লাহ বান্দাকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া যত না নিকৃষ্ট, ইলমুল কালামে লিপ্ত হওয়া তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট।'[৮৭]

---

[৮৫] মোল্লা আলি কারি, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা : ৭

[৮৬] এ ছাড়া আরও অনেকেই ইলমুল কালাম থেকে ফিরে এসেছেন। যেমন, ইমাম আবুল ওয়ালিদ কারাবিসি, নুয়াইম ইবনু হাম্মাদ, আবুল হাসান আশআরি, কাজি আবু বাকর বাকিল্লানি, আবুল ফাতহ আশ-শাহরিস্তানি (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। [নিরীক্ষক]

[৮৭] ইমাম ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন : ৪/৮৪২; ইমাম ইবনুল জাওযি, তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১৯

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'ইলমুল কালামের চর্চাকারী কখনোই সফল হবে না। কালামশাস্ত্রের বিদ্বানরা যিন্দিক।'[৮৮]

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন—বিদআতি ও প্রবৃত্তির অনুসারী লোকদের সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর অনেক সাথি বলেছেন, এর মাধ্যমে তিনি কালাম-চর্চাকারীদেরই উদ্দেশ্য করেছেন।[৮৯]

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই আকিদাহকে মানবীয় যুক্তি থেকে পরিশুদ্ধ রাখা কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয় বরং তা-ই মূল বিষয়। যদি এই আকিদাহ মানবীয় মতামতের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাহলে সেটা আর আল্লাহপ্রদত্ত আকিদাহ থাকে না। এমন থাকে না, যা দুনিয়া-আখিরাতের মহাকল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সম্ভবত আপনি আরও স্পষ্ট হতে চাচ্ছেন। তাহলে চলুন, আমরা ইতিহাসকে জিজ্ঞেস করি। এর যুগপরম্পরা থেকে ঘুরে আসি। কুরআন আমাদের বলছে,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

> 'যার (কুরআন) সামনে কিংবা পেছন থেকে কোনো ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[৯০]

সমস্ত নবি-রাসুল তাওহিদের বিশুদ্ধ আকিদাহ নিয়েই আগমন করেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

> 'আপনার আগে আমি যত রাসুলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি আমি এই ওহিই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত করো।'[৯১]

এটি কুরআনের সত্য সাক্ষ্য।

[৮৮] তালবিসুল ইবলিস, পৃষ্ঠা : ১৯

[৮৯] মোল্লা আলি কারি, শারহুল ফিকহিল আকবার

[৯০] সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২

[৯১] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৫

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আকিদাহ পরিবর্তন

এ পর্যায়ে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন পাতা অনুসন্ধান করে দেখব ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কীভাবে আকিদাহ পরিবর্তন করেছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

'ইহুদিরা বলে—উযায়ির আল্লাহর পুত্র। খ্রিষ্টানরা বলে—মাসিহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র। এ তো স্রেফ তাদের মুখের কথা। তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতোই বলছে। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর। কীভাবে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে!'[৯২]

আপনি 'কিতাবুল মুকাদ্দাস' খুললে দেখবেন বইটা যতসব পৌত্তলিক বর্ণনায় ভরে আছে। এর তৃতীয় সংশোধনীতে লেখা আছে,

فنادى الرب الاله آدم وقال له اين انت؟

'মহান রব আদমকে ডাক দিয়ে বললেন—তুমি কোথায়?'[৯৩]

ইয়া রব, তারা যা বলে আপনি তা থেকে পুত-পবিত্র এবং মহিমান্বিত! তিনি নাকি জানেন না আদম কোথায়? তাহলে তিনি কেমন ইলাহ? তিনি কি গোপন বিষয় জানেন না? তিনি কি এরচেয়েও গুপ্ত বিষয়ে পরিজ্ঞাত নন, যেমনটি কুরআন আমাদের বর্ণনা করেছে?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তুমি কি ভেবে দেখোনি যে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ জানেন? যেকোনো তিনজনের গোপন কথা হলে, তিনি থাকেন তাদের চতুর্থজন। আর পাঁচজনের হলে তিনি থাকেন ষষ্ঠজন। এরচেয়ে কম কিংবা বেশি হলেও যেখানেই তারা থাকুক তিনি তাদের সাথেই থাকেন। এরপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

[৯২] সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৩০

[৯৩] বুক অব জেনেসিস, ৩ : ৯

সবকিছুই অবগত রয়েছেন।'[১৪]

তারা কি আল্লাহর এই ঘোষণা শোনেনি?

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'তোমরা তোমাদের কথা গোপন রাখো কিংবা প্রকাশ করো, তিনি তো অন্তরের বিষয়ে সম্যক অবগত।'[১৫]

আকিদাহ বিকৃতির ফলাফল

তারা আসমানি কিতাব এবং আল্লাহপ্রদত্ত আকিদাহয় বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটিয়ে কী অর্জন করল? তারা কেবল অভিশাপ আর দুর্ভাগ্যই অর্জন করেছে, যা আজ গোটা মানবজাতি বয়ে বেড়াচ্ছে। এই ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তারা অনেক কথা কিতাবে অনুপ্রবেশ করায়। এ বিষয়টা কুরআন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

'যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণের জন্য বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে", তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[১৬]

খ্রিষ্টানদের অনুপ্রবেশমূলক কর্মকাণ্ডের মাঝে ছিল ত্রিত্ববাদের আকিদাহ।[১৭] তারা মানব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রে মানবীয় চিন্তাপ্রসূত তথ্যাবলিও নিজেদের ধর্মে অনুপ্রবেশ করায়। ভূগোল নিয়েও তারা বেশ কিছু

---

[১৪] সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭

[১৫] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ১৩

[১৬] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৭৯

[১৭] তিন সত্তার সমষ্টি ঈশ্বর—এটাই ত্রিত্ববাদ (Trinitarian Doctrine)। এ তিন সত্তা হলো—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এ ছাড়াও খ্রিষ্টসমাজে ত্রিত্ববাদের নানা ব্যাখ্যা ও মত প্রচলিত রয়েছে। যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক, এ যে আল্লাহর তাওহিদের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। [তাদা-সম্পাদক]

বই লেখে। সেগুলোর নাম দেয় 'খ্রিষ্টীয় ভূগোল'।[৯৮] যারাই এর বিপরীত মতামত দিত, তাদের কাফের আখ্যায়িত করত। যেসব ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কারের ঘোষণা করত, গির্জা তাদের খোঁজা শুরু করে। গির্জার ব্যবস্থাপকরা 'তদন্ত পরিষদ' নামে তাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলতে থাকল। ফলে যেসব বিজ্ঞানী গির্জার দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ছিল, তারা বিভিন্ন বন-জঙ্গল ও গিরিগুহায় আত্মগোপন করে। ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গির্জার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করায় প্রায় তিনলক্ষ খ্রিষ্টানকে শাস্তি দেয়া হয়। বত্রিশহাজার মানুষকে জলজ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তাদের মাঝে পদার্থবিজ্ঞানী ব্রুনোসহ[৯৯] আরেক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী গ্যালিলিও ছিল।[১০০] কারণ, সে পৃথিবীর ঘূর্ণনতত্ত্ব লালন করত। এ ছাড়াও দণ্ড দেয়া হয় বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসকে।[১০১]

অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, এক খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী বলেই ফেলল, কোনো ব্যক্তির জন্য খ্রিষ্টান হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা কিংবা আগুনে পুড়ে মারা আবশ্যক। ফলাফল কী হলো? ফলাফল হলো ধর্ম ও বিজ্ঞানে অনিবার্য দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগল কীভাবে গির্জার কর্তৃত্ব, দাপট ও চরম সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারা চিন্তা করল প্রথমে গির্জার ঈশ্বরকে দমন করতে হবে, তাহলেই গির্জা বাতিল হয়ে যাবে। গির্জা তো দীর্ঘায়িত হচ্ছে ঈশ্বরের নামেই। প্রথমেই

---

[৯৮] উসতায আবুল হাসান আলি নাদবি, মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা : ৫৭১

[৯৯] জিওর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) [১৫৪৮—১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৬০০] : একজন ইতালীয় জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, গণিতবিদ ও অকাল্টিস্ট। প্রকৃত নাম ফিলিপ্পো ব্রুনো। জিওর্দানো তার উপাধি। তার মতে মহাবিশ্ব অসীম, এ বিশ্বের মতো আরও বিশ্ব রয়েছে। তা ছাড়া কোপার্নিকাসের মতো তারও বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। ফলে প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের বিরোধিতার (heresy) অপরাধে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০০] গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei) [১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৪—৮ জানুয়ারি, ১৬৪২] : ইতালীয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। গ্যালিলিও থার্মোস্কোপসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক কম্পাস আবিষ্কার করে। এক ওলন্দাজ চশমা নির্মাতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের কথা শুনে ১৬০৯ সালে গ্যালিলি উন্নতমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করে। ১৬২৪ সালে প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর মতে পৃথিবী নয়, বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে সবকিছু ঘুরছে। ফলে তাকেও চার্চের রোষানলে পড়তে হয়। গৃহবন্দির আট বছরের মাথায় ৭৭ বছর বয়সে গ্যালিলিও মৃত্যুবরণ করে। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০১] নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) [১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৪৭৩—২৪ মে, ১৫৪৩] : গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও ক্যাথলিক যাজক। কোপার্নিকাসকে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জনক বলা হয়। তার মতে সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘুরছে, যা তৎকালীন খ্রিষ্টধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। [ভাষা-সম্পাদক]

তারা সংগ্রাম করে গির্জার বেশকিছু শিক্ষাকে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। সেগুলো অস্বীকার করে বসে। যেমন, লুথারের সংস্কার আন্দোলন[১০২], কেলভিনের আন্দোলন[১০৩] ইত্যাদি। তারা পোপের শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই শিক্ষাগুলোকে শয়তানের দীক্ষা বলে অভিহিত করে। যেমন, ত্রিত্ববাদ, ক্ষমাপ্রাপ্তির ছাড়পত্র বিক্রি[১০৪], অপরাধের স্বীকারোক্তি। এই দুই সংস্কারকর্মী ও পোপের মাঝে ঘোরতর এক লড়াই শুরু হয়েছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুরু হয় এক নবযুগের সূচনা। তারা এর নাম দিয়েছে

---

[১০২] মার্টিন লুথার (Martin Luther) [১০ নভেম্বর, ১৪৮৩—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৫৪৬] : জার্মান ধর্মযাজক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ও ধর্মসংস্কারক। মার্টিন লুথার ষোড়শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোনের পথিকৃৎ। ইন্ডালজেন্স (indulgence) অর্থাৎ ক্ষমাপ্রাপ্তির ছাড়পত্র নামক প্রতারণার কঠোর বিরোধিতা করে লুথার। পাপমোচনের জন্য অর্থের বিনিময়ে পোপ কর্তৃক একধরনের মুক্তিপত্র হচ্ছে এই ইন্ডালজেন্স (indulgence)। তার মতে পাপমোচনের জন্য অর্থ দিয়ে নিষ্কৃতিপত্র কেনার দরকার নেই। এটা একটা ধোঁকা। এই অন্যায় কাজকর্মের বিষয়ে লুথার ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর ৯৫টি প্রশ্ন রচনা করে তা উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জার দরজায় ঝুলিয়ে দেয়। লুথার উত্থাপিত এ ৯৫টি প্রশ্ন '৯৫ থিসিস' নামে পরিচিত। এই থিসিসের প্রশ্নগুলি জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিজ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই রচনা করে লুথার। লুথার ও পোপকে সমর্থনের প্রশ্নে জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। ১৫৪৩—১৫৫৫ পর্যন্ত জার্মানিতে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মাঝে গৃহযুদ্ধ চলে। গৃহযুদ্ধ চলাকালেই লুথারের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অগাসবার্গের সন্ধির মাধ্যমে জার্মানিতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। সন্ধি অনুযায়ী প্রত্যেক জার্মান রাজা নিজ জনগণের ধর্ম নির্ধারণ করবে। ফলে উত্তর জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চলে 'লুথারবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০৩] জন কেলভিন (John Calvin) [১০ জুলাই, ১৫০৯—২৭ মে, ১৫৬৪] : ফরাসি ধর্মতত্ত্ববিদ, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্যতম সংস্কারক নেতা। লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্ব সূত্রাবদ্ধ ছিল না, কেলভিন তার বইয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের সকল নিয়মরীতির যৌক্তিক উপস্থাপনা পেশ করেছে। কেলভিন বিশ্বাস করত ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান। সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিস্তারে কেলভিন জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। লুথার ও কেলভিনের ধর্মতত্ত্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। কেলভিনের ধর্মতত্ত্ব ছিল বিধিবিধান-নির্ভর। তার ধর্মমত ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) বেশি কাছাকাছি ছিল। লুথার ক্যাথলিকদের যাজকশ্রেণির ক্রমবিভাজন অস্বীকার করা সত্ত্বেও কিছু কিছু রেখে দেয়। অপরদিকে কেলভিন এ সবকিছুই অস্বীকার করে। কেলভিন ধর্মীয় প্রার্থনায় সরলতা ও অনাড়ম্বরতার প্রতি জোর দেয়। গির্জা থেকে সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ করে। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০৪] ক্ষমাপ্রাপ্তির ছাড়পত্র (indulgence)—পাপমোচনের জন্য অর্থের বিনিময়ে পোপ কর্তৃক একধরনের মুক্তিপত্র। [ভাষা-সম্পাদক]

এনলাইটেনমেন্ট বা আকল-বুদ্ধির সার্বভৌমত্বের যুগ।[১০৫] এইসময়েই জন্ম নেয় নিৎশে।[১০৬] সে ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা করে, ধর্মের ওপর বুদ্ধির কর্তৃত্ব চলবে। তারপর আসলো হেগেল।[১০৭] সে ধর্মকে নানা সমস্যায় জর্জরিত করতে প্রচেষ্টা চালায়। এতে পৃষ্ঠপোষকতা করে। হেগেলের মতে বিবেকের নামই 'আল্লাহ', অথচ তাদের শিরকি কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ পুত-পবিত্র এবং মহামহিমান্বিত।

---

[১০৫] এনলাইটেনমেন্ট হচ্ছে ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে বের হয়ে বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখা, সবকিছুর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। ইমানুয়েল কান্টের মতে, 'এনলাইটেনমেন্ট হচ্ছে মানুষের স্ব-আরোপিত অপরিপক্কতা বা নাবালকত্ব থেকে বেরিয়ে আসা। এই অপরিপক্কতা বা নাবালকত্ব হচ্ছে অন্যের (ধর্ম, চার্চ) পরামর্শ-উপদেশ বা নির্দেশনা ছাড়া নিজের যুক্তি ও বিবেচনাবোধকে ব্যবহার করবার অক্ষমতা।' (দেখুন, কোর্স : পাশ্চাত্যবাদ ও চিন্তাবিনির্মাণ, ইলমওয়েব স্কুলিং) [ভাষা-সম্পাদক]

[১০৬] ফ্রিডরিখ নিৎশে (Friedrich Nietzsche) [১৫ অক্টোবর, ১৮৪৪—২৫ আগস্ট, ১৯০০] : জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ও কবি এবং ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের পূর্বসূরী। নিৎশে ছিল জাতীয়তাবাদ ও ইহুদিবিদ্বেষের অত্যুৎসাহী প্রতিপক্ষ। তার একটি কুখ্যাত মন্তব্য—ঈশ্বর মৃত, আমরাই তাকে মেরে ফেলেছি। তার মতে নৈতিকতা আপেক্ষিক বিষয়। নিৎশের দর্শনমতে প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা ও বাঁচা-মরার সংগ্রাম চলছে। তাই, দুর্বলের ওপর সবলের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক বিষয়। দাস, মালিক, প্রভু, শোষক-শাসিত এগুলো প্রকৃতিগত ব্যাপার। ক্ষমতাবিস্তার ও অন্যের ওপর শোষণ করা যেমন স্বভাবজাত, ঠিক তেমনি দাস হয়ে শোষণ মেনে নেয়াও প্রকৃতির অনিবার্য দাবি। টিকে থাকার সংগ্রামের স্বাভাবিকতার ভেতর দিয়ে আসা ফলাফলগুলিও স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। নিৎসে বলেছিল, শ্রমিকশ্রেণিকে বশে রাখতে হলে তাদের মাঝে দাসত্বের মনোভাব এবং পুঁজিবাদী প্রভুদের মাঝে প্রভুত্বের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। নিৎশে জীবনের শেষ সময়ে পাগলামিতে ভুগছিল। তার কিছু রচনা : Beyond Good and Evil, The Birth of Tragedy, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits, On the Genealogy of Morals, Philosophy in the Tragic Age of the Greeks, Thus Spoke Zarathustra, Twilight of the Idols, The Will to Power ইত্যাদি। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০৭] গেয়র্গ ভিলহেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) [২৭ আগস্ট, ১৭৭০—১৪ নভেম্বর, ১৮৩১] একজন জার্মান দার্শনিক এবং জার্মান ভাববাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাস্তবতার ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক ও ভাববাদী অবস্থান ইউরোপীয় দর্শনকে বিপ্লবী করে এবং মহাদেশীয় দর্শন ও মার্ক্সবাদের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হয়। জগৎ বা সত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের দ্বৈত রূপ হেগেল অস্বীকার করলেও তার কাছে মূল হচ্ছে ভাব; বস্তু নয়। যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্যমান সবই হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ। এ ছাড়া ভাবের চরম বিকাশ জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রে ঘটেছে বলে হেগেলের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। বস্তুত হেগেল দর্শন থেকে পরবর্তীকালে দুটো পরস্পরবিরোধী ধারার বিকাশ ঘটেছে। এর একটি হচ্ছে মার্ক্সবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আর অন্যটি হচ্ছে নব ভাববাদ বা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে। তারা এই যুগের নাম দেয় দৃষ্টবাদের যুগ বা বোধের আধিপত্যের যুগ।[১০৮] বাস্তবতা ও প্রকৃতিকে সকল শক্তির উৎস মনে করে এবং বুদ্ধি ও ধর্মের ওপর প্রকৃতির কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়। তারা ঘোষণা করে, মানুষের বুদ্ধি হলো প্রকৃতির সন্তান। তারা বলে, মানুষের পথচলা শুরু হয় নিঃসঙ্গ অবস্থায় আর শেষ হয় দলবদ্ধ অবস্থায়। তাই একক ব্যক্তিত্বকে দলবদ্ধতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতিই মানুষের বিবেকে বাস্তবতার চিত্র এঁকে দেয়।

সেই যুগের বিখ্যাত মনীষী হচ্ছে অগাস্ট কোঁৎ।[১০৯] আমি বুঝি না কীভাবে প্রকৃতি মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তবতার চিত্র আঁকে। প্রকৃতি গরু আর বানরের মাথায় যে বাস্তবতার চিত্র আঁকে, কোঁৎ ও অন্যান্যদের মাথায়ও কি সে রকম চিত্রই আঁকে?[১১০]

এই যুগেই আসে ডারউইন।[১১১] ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সে তার বই On the Origin of Species প্রকাশ করে এবং ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে সে The Descent of Man নামে প্রকাশ করে আরও একটি বই। তখনই বিবাদ চরমে পৌঁছে যায়। ডারউইন ও গির্জার অনুসারীদের মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে। গির্জার অনুসারীরা তাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেয়। যদিও প্রথম প্রথম বাহ্যত সাধারণের ঝোঁক ছিল গির্জার দিকে, কিন্তু প্রতিনিয়ত চিত্র পাল্টে যেতে লাগল। ডারউইনের পক্ষে জনমত তৈরি হতে থাকে। ধর্মের নামে প্রতারণা আর ক্ষতির শিকার

---

[১০৮] ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদী সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা। অগাস্ট কোঁৎ তার Course de Positive Philosophy গ্রন্থে মানবসমাজের ক্রমবিকাশকে তিনটি স্তরে ভাগ করে—দেবতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও দৃষ্টবাদ। কোঁৎ জ্ঞানের বিকাশে তিনটি স্তর চিহ্নিত করে। তার মতে জ্ঞানবিকাশের আদিম যুগ হচ্ছে ধর্মীয় যুগ। এ যুগে মানুষ অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও ঈশ্বরের ধারণার ভিত্তিতে সবকিছুর ব্যাখ্যা করেছে। দ্বিতীয় যুগ হলো দার্শনিক যুগ। এ যুগে মানুষ চরম সত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে জগতের ব্যাখ্যা করেছে। তৃতীয় বা শেষযুগ হচ্ছে দৃষ্টবাদ (Positivism)। এখানে মানুষ দৃষ্ট প্রকৃতিকে চরম কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবকিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রকৃতিকেই স্বীকার করবে। এ যুগে ঈশ্বর বা অন্য কোনো অতিপ্রাকৃত ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[১০৯] অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) [১৯ জানুয়ারি, ১৭৯৮—৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭] : ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী। তাকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা। তার মতে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয় বরং মনুষ্যত্বই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। ১৮৩৯ সালে কোঁৎ সর্বপ্রথম Sociology শব্দটি ব্যবহার করে। [ভাষা-সম্পাদক]

[১১০] ড. মুহাম্মাদ আল-বাহি, আল-ফিকরুল ইসলামিল হাদিস ও সিলাতুহু বিল ইসতিমারিল গারবি, পৃষ্ঠা : ৯৭২, ৮১০

[১১১] চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) [১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯—১৯ এপ্রিল, ১৮৮২] : ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ও জীববিজ্ঞানী। ডারউইনকে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের জনক বলা হয়। তার মতে মানুষের আবির্ভাব ও বিবর্তন প্রাকৃতিক কারণে। [ভাষা-সম্পাদক]

হওয়া মানুষগুলো একে মুক্তি ও স্বাধীনতার অসাধারণ সুযোগ মনে করে।[১১২]

ডারউইন একসময় প্রাণের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বসে। সে বলে, প্রাণের ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা হলো এমন একটি পদার্থকে যুক্তকরণ, যা প্রকৃতির নির্ভেজাল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেয়। তারপর আসে মার্ক্স।[১১৩] সে এসে অর্থনৈতিক আলোচনা-পর্যালোচনার ভাঁজে ভাঁজে নাস্তিক্যবাদের ঘোষণা দিতে থাকে। সে বিশ্বাস করত ধর্ম, রুহানিয়াত (আত্মিক শক্তি), চরিত্র ও ভালো আচরণ বস্তুবাদের বিপরীত মেরুর বস্তু; বরং মানবসভ্যতার ইতিহাস হলো খাবার সন্ধানের ইতিহাস। মেনোফেস্টোতে সে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান নির্বাচন করে—মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য, বাসস্থান ও জাতীয়তাবাদের প্রতি আত্মনিবেদন।[১১৪] তার মতে ধর্ম মানবজাতির জন্য আফিম।

তারপর আসে ফ্রয়েড।[১১৫] সে এসে কামজগতে নিজের আওয়াজকে জোরালো করতে থাকে। সে বলে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিই মানুষক পরিচালিত করে। রুহের (আত্মা) কোনো অস্তিত্ব নেই। মানবজীবন পুরোটাই কামপ্রবণতার স্ফুরণ মাত্র। এমনকি ধর্ম, স্বভাব-আচরণও মূলত কামতাড়নার ফলাফল। পুত্রসন্তান তার মাকে ভালোবাসে মূলত সুপ্ত কামবাসনা থেকে। কিন্তু সে তার বাবাকে দেখতে পায়, বাবা তার ও তার মায়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যার ফলে তার মাঝে এক ধরনের বিরাগ বা বিকর্ষণ ঠায় নেয়। একজন কন্যাশিশুও তার বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত কামপ্রবণতার কারণেই। কিন্তু সে তার আর বাবার মাঝে মাকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখতে পায়। তখন তার মাঝে ঠায় নেয় এক ধরনের বিরাগ বা বিকর্ষণ।

---

[১১২] আত-তাতাওয়ুর ওয়াস সাবাত ফি হায়াতিল বাশারিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৬১

[১১৩] কার্ল হাইনরিশ মার্ক্স (Karl Heinrich Marx) [৫ মে, ১৮১৮—১৪ মার্চ, ১৮৮৩] : একজন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও অর্থনীতিবিদ। কার্ল মার্ক্সকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক বলা হয়। তার মতে এই জড়জগৎ ছাড়া আর কোনো সত্তা নেই। মার্ক্স বলেছে—ধর্ম জাতির জন্য আফিম। শ্রেণিহীন সমাজগঠনে শ্রমিকবিপ্লব মার্ক্সবাদের অন্যতম কথা। Das Kapital তার অন্যতম রচনাকর্ম। [ভাষা-সম্পাদক]

[১১৪] ড. মুহাম্মাদ আল-বাহি, আল-ফিকরুল ইসলামিল হাদিস ও সিলাতুহু বিল ইসতিমারিল গারবি, পৃষ্ঠা : ৬২৩

[১১৫] সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) [৬ মে, ১৮৬৫—২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯] : একজন অস্ট্রিয়ান স্নায়ুবিশারদ। ফ্রয়েডকে মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তার মতে কামপ্রবৃত্তি মানুষের সব চিন্তাভাবনার নিয়ামক এবং অবাধ যৌনাচারে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা দৈহিক ও মানসিক বিকারের কারণ। ফ্রয়েডের মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যৌনতা। [ভাষা-সম্পাদক]

গির্জা ও এদের মাঝে অব্যাহত যুদ্ধের পর গির্জার লোকেরা এর চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ হয়ে গেল। বিষণ্ন তরবারির মতো ফিরে গেল তারা। আর মানুষের মন থেকে গির্জার ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যায়; অথচ একসময় মানুষই এই ঈশ্বরের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিত। এর কারণও খুব সহজ। আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীন ও এর বিশুদ্ধ আকিদাহ এই যুদ্ধে প্রবেশই করেনি, বরং এ যুদ্ধে প্রবেশ করেছে নতুন উদ্ভাবিত মানবীয় কিছু অপরিপক্ক মতবাদ। মানবীয় এ মতবাদগুলো এমনসব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম পরিসংখ্যানের মোকাবেলা করছিল, যার ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছিল মজবুত প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতার ওপর।

উসতায মুহাম্মাদ আল-বাহি বলেন,

> 'এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, আসলে দ্বীনের সাথে বিজ্ঞানের যে বিরোধ, সেটা মূলত খ্রিষ্টীয় গির্জাবাদের সাথে মানবীয় গবেষণার বিরোধ। এই বিরোধের কারণ ওইসব পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, যা গির্জা পশ্চিমাদের জীবনে চাপিয়ে দিয়েছিল।'[১১৬]

এখন গির্জার অবস্থান কী? এখন সে মানুষের পেছন পেছন ঘুরঘুর করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে। সে মানুষের কাছে এতটুকুই আশা করে, তারা যেন সপ্তাহে অল্পকিছু সময় হলেও গির্জায় আসে। পাশাপাশি এর জন্য তারা বিভিন্ন পুরষ্কার এবং প্রলুব্ধকর বিষয়ের ঘোষণা করে থাকে।[১১৭] গির্জার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন অনুষদের দরজায় ঝুলানো ঘোষণাটা খেয়াল করুন—

> রবিবার, পহেলা অক্টোবর, ১৯৫০ ইং, বিকেল ৬টা : রাত্রিকালীন হালকা নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে, যাদুকরি কিছু খেলা, ধাঁধাঁ, কিছু প্রতিযোগিতা, কিছু প্রমোদায়োজন, নৃত্য পরিবেশনা।

আপনি কি শুনতে পাননি, এখন গির্জা তাদের অনুরোধ জানায়, একটু প্রমোদ ও নৃত্যের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে হলেও যেন তারা গির্জায় জড়ো হয়? কিন্তু গির্জার এহেন পরাজয় সত্ত্বেও দ্বীন আর বিজ্ঞানের মাঝে সেই দ্বন্দ্ব রয়েই গেছে। এই দ্বন্দ্ব এখনো মানবজাতিকে ক্লান্ত ও হতভাগ্য করে রেখেছে। এর পরিণাম আমরা এখনো ভোগ করে যাচ্ছি। আমরা, আমাদের সন্তানাদি, আমাদের প্রজন্ম এর মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছে। বিমূঢ়তা, অস্থিরতা, দুঃখ, দুর্ভাগ্য বয়ে সামনের দিনগুলোতেও এর মূল্য দিয়ে যেতে হবে।

---

[১১৬] আল-ফিকরুল ইসলামিল হাদিস ও সিলাতুহু বিল ইসতিমারিল গারবি, পৃষ্ঠা : ৫১২

[১১৭] উসতায সাইয়িদ কুতুব, আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারাতি, পৃষ্ঠা : ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞান ও ধর্ম

ইউরোপে বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা আমাদের ভূমিগুলোতেও আছড়ে পড়তে থাকে, এমনকি আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরও আক্রান্ত করতে থাকে। বিশেষত যারা পশ্চিমা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হয় অথবা এসব অঞ্চলে সেগুলোর শাখাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা শেষ করে, এই রোগ তাদের সংক্রমিত করে। তারপর তারা দ্বীনের বিরুদ্ধে দ্বেষ ও বৈরিতা শুরু করে দেয়। তারা মনে করে, আমাদের আকিদাহ ও জীবনধারাও বুঝি বিজ্ঞানবিদ্বেষী। তাদের মাঝে এ ধারণাও জন্মায়, আমাদের দ্বীনও গির্জাকেন্দ্রিক ধর্মের মতো, যা কিনা বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও আবিষ্কারের সাথে লড়াই ও সংঘর্ষ বাধিয়ে রাখে।

কিন্তু এ তো ওই রং আর রূপ, তাদের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহ থেকে যা দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা রঙিন হয়েছে। সেটা ছিল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে কঠোরতার রং এবং এ দুইয়ের মাঝে শত্রুতা। কিন্তু আমাদের সন্তানেরা এই বিবাদের উৎসমূল না-ঘেঁটেই এবং ওই যুদ্ধবিগ্রহের কারণ অনুসন্ধান না-করেই অধৈর্য হয়ে এগুলো প্রচার করেছে। অবশেষে আমরাও ইউরোপীয় বস্তুবাদী চিন্তাদর্শনের পেছনে ছুটলাম। পদে পদে, মেপে মেপে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। এমনকি তারা যদি দবের[১১৮] গর্তেও প্রবেশ করে, আমরাও ওতে প্রবেশ করব! আমাদের প্রিয় সন্তানেরা কুরআনের এই কথা ভুলেই গেল—

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

---

[১১৮] গর্তে বাসকারী টিকটিকির মতো চার পাবিশিষ্ট, বড় আকারের এক ধরনের প্রাণী। এর প্রশস্ত লেজও রয়েছে। দেহ ঘন অমসৃণ। মরুভূমিতে এর দেখা মেলে। এটা খাওয়া হালাল। তবে বাংলায় ভুলে অনেকে গুইসাপ অনুবাদ করেন। গুইয়ের আরবি হচ্ছে 'ওয়ারাল'। সঠিক কথা হলো দব আর গুই এক নয়। এমনকি দুটোর বৈজ্ঞানিক নামও আলাদা। [নিরীক্ষক]

'তোমাদের যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন।'[১১৯]

আর তারা যেন কুরআনের এই আয়াত কখনো পড়েইনি,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'বলুন—যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?'[১২০]

কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তারা ভুলেই গেল। আল্লাহ ভূত-ভবিষ্যৎ সবই জানেন। নতুন নতুন কেমন প্রজন্ম পাঠাবেন এবং কোন কোন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটাবেন, তিনি জানেন। নতুন নতুন রহস্য উন্মোচন ও উদ্ভাবন করার অর্থই হলো এই মহাবিশ্বে আল্লাহর রীতিনীতি এবং ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতির প্রক্রিয়াকে জানা। যে আল্লাহ এই মহাজাগতিক রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি করেছেন, তিনিই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনিই ওই সত্তা, যিনি সুন্নাহ দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথা বলিয়েছেন।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না। তিনি তো তাই বলেন, যা তাঁর প্রতি ওহি করা হয়।'[১২১]

আল্লাহর অস্তিত্ব ও বিজ্ঞান

আল্লাহর মহাজাগতিক রীতিশৈলীর সাথে কুরআনে বর্ণিত নিয়ম-কানুনের সংঘাত হওয়া অসম্ভব। এই মহাজগৎ আল্লাহর দৃশ্যত চলন্ত গ্রন্থ, আর কুরআন আল্লাহর লিখিত গ্রন্থ। তাই, এই দুগ্রন্থের মাঝে কোনো সংঘর্ষ হতে পারে না। আর এ বিষয়টি আমাদের কাছে তখনই গৃহীত হবে, যখন আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করব এবং এই বিশ্বাস লালন করব যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ক্রমধারায় বর্ণিত। যদি কেউ কুরআনের কোনো একটি বর্ণের প্রতিও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে, সে নিশ্চিত কুফরিতে লিপ্ত হবে। দুনিয়ার যেকোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের সাথে আল্লাহর কুরআনের কোনো আয়াত এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১১৯] সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১

[১২০] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৯

[১২১] সূরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩-৪

ওয়াসাল্লামের প্রমাণিত কোনো বিশুদ্ধ হাদিসের দ্বন্দ্ব হতে পারে না। আর যদি কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে পরবর্তীকালে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি দিন টেকেনি। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেগুলোকে আমরা স্বীকৃত মনে করি সেগুলোর প্রবক্তারা বেঁচে থাকা অবস্থায়-ই সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিরে এসেছেন অথবা পরবর্তীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভুলগুলো প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

আমরা বিংশ শতাব্দীর ওইসব বিজ্ঞানীর কথা ভুলব না, যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোলসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য ময়দানে বিচরণ করেছেন। শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দ্বীন ও গায়িবি (অদৃশ্য) বিষয়ে দ্বন্দ্বে জড়ানো থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন তারাও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতে শুরু করেছেন।

এমন এক ইচ্ছাশক্তির কথা স্বীকার করছেন, যে শক্তি এই মহাবিশ্বসহ তার অভ্যন্তরের সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। এখন বিজ্ঞানও আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। গায়িবের বিষয়াবলির সঙ্গী হয়েছে। কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। কিন্তু আমরা যখন বলি, বর্তমানে বিজ্ঞানও আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যবহন করছে এবং আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ধারণাকে অস্বীকার করছে, এ কথায় আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আন্তরিক সত্যায়নের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক কথার অবতারণা করছি বরং এই বিজ্ঞানের আগমন ও উৎপত্তিরও আগে আমরা ইমান এনেছি। আমরা রব হিসেবে আল্লাহর ওপর, দ্বীন হিসেবে ইসলামের ওপর এবং নবি ও রাসুল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইমান এনেছি। অমুক-তমুকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার আগেই আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে এসব তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের কথা ওই লোকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য আনছি, যারা স্রষ্টার প্রতি নিজেদের অস্বীকৃতি প্রমাণ করাসহ সমাজে নাস্তিক্যবাদ উগ্‌ড়ে দেবার জন্য বিজ্ঞানমনস্কতার দাবি করে।

এই শতাব্দীতে এমনকিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা বিজ্ঞানের রাস্তা ধরে নাস্তিক্যবাদের দিকে আহ্বান করছে। গবেষণার ময়দানে সুউচ্চ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে এরা আসলে মূর্খ; যদি তারা প্রকৃতপক্ষেই গবেষক হয়ে থাকেন। আর ইচ্ছে না-থাকলে আপনি যা শুনবেন, তা-ই গিলবেন।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

> 'কাফিরদের উদাহরণ হলো, যেমন এক ব্যক্তি কোনো কিছুকে চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু যাকে ডাকে, সে তার ডাকটা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। তাই তারা বোঝে না।'[১২২]

আপনারা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে *The Evidence of God in an Expanding Universe* বইটি পড়ুন।[১২৩] বিশেষ করে বইটিতে অধ্যাপক রাসেল আর্টিস্টের[১২৪] কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> 'পৃথিবীর বুকে অস্তিত্বশীল মিলিয়ন মিলিয়ন প্রাণিকোষ আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যবহন করছে, যার প্রমাণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবেও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর তাই আমি সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।'[১২৫]

এ ছাড়াও পড়তে পারেন ক্রেসি মরিসনের[১২৬] লেখা *Man Does Not Stand Alone*। অথবা পড়তে পারেন উসতায আবদুর রাযযাক নাওফালের[১২৭] লেখা ধারাবাহিক সিরিজ—الله والعلم الحديث (আল্লাহর অস্তিত্ব এবং আধুনিক বিজ্ঞান), الاسلام والعلم الحديث (ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান), القرآن والعلم الحديث (কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান), طريق الي الله (চলো আল্লাহর পরিচয় জানি), بين الدين والعلم (দ্বীন ও বিজ্ঞানের মাঝে যোগসূত্র) ইত্যাদি।

---

[১২২] সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৭১

[১২৩] জন ক্লভার মন্সমা (John Clover Monsma) সম্পাদিত। [ভাষা-সম্পাদক]

[১২৪] রাসেল চার্লস আর্টিস্ট (Russell Charles Artist) [৫ জানুয়ারি, ১৯১১—২৪ ডিসেম্বর, ২০০০] : জীববিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিদ। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার ফ্রান্সিসভিলে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। University of Minnesota থেকে বোটানির ওপর পিএইচডি করেন। কর্মজীবনে মূলত ছিলেন শিক্ষক। 'David Lipscomb College, Nashville, Tennessee'-এর জীববিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টে ২৩ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৩ বছর ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালিয়েছেন। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একপ্রকার নিজেকে উৎসর্গ করেন তিনি। [ভাষা-সম্পাদক]

[১২৫] দেখুন, তাফসির ফি যিলালিল কুরআন : ৭/৩৩২ [লেখক]

[১২৬] আবরাহাম ক্রেসি মরিসন (Abraham Cressy Morrison) [০৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৪—০৯ জানুয়ারি, ১৯৫১] : আমেরিকান কেমিস্ট এবং New York Academy of Sciences-এর প্রেসিডেন্ট। মরিসন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের রেনথামে জন্মগ্রহণ করেন। [ভাষা-সম্পাদক]

[১২৭] আবদুর রাযযাক নাওফাল (عبد الرزاق نوفل) [০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭—১২ মে, ১৯৮৪] : মিশরীয় লেখক। [ভাষা-সম্পাদক]

আকিদাহর ছায়ায়

আল্লাহ এই মহান দ্বীনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমি এই কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি, আমিই এই কুরআনকে সংরক্ষণ করব।'[১২৮]

এখন আমরা দেখব এই আকিদাহর ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান কী। আসলে বিশুদ্ধ আকিদাহয় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মহৎ ও মর্যাদাবান হয়ে ওঠেন। তাঁরা এই মহাবিশ্বের সর্বোত্তম অবস্থানে সমাসীন হন। আল্লাহ তো আসমান-জমিনের সবকিছুই তাঁদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১২৯]

আল্লাহ যার জন্য আসমান-জমিনের সবকিছু অবনত করে দিয়েছেন, সে তো আসমান-জমিন থেকেও মূল্যবান।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে এর কোনো কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলো আমি যথার্থ উদ্দেশ্য নিয়েই বানিয়েছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'[১৩০]

আল্লাহ মানবসৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন, মালাকদের আদমের সামনে সাজদাহ করার আদেশ করলেন, যেন স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহর কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা কতটুকু।

---

[১২৮] সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৯

[১২৯] সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫ : ১৩

[১৩০] সূরা আদ-দুখান, ৪৪ : ৩৮-৩৯

তাই, কুরআনের অনেক আয়াত মানুষকে সম্মান করতে এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখতে উৎসাহপ্রদান করেছে,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

'অবশ্যই আমি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি থেকে তাদের রিযকের ব্যবস্থা করেছি এবং আমার সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।'[১০১]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি। তারপর আবার সর্বনিকৃষ্টে পৌঁছিয়েছি। তবে তারা ব্যতীত, যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন পুরস্কার।'[১০২]

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, এই মহান দ্বীনের ছায়ায় অবস্থানকারী সব মানুষই সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আর তাদের সম্মান রক্ষা করা, মর্যাদা বজায় রাখা আকিদাহর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই মানুষের বড় ভূমিকা থাকা আবশ্যক। আয়াতটি সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'যখন তোমার রব মালাকদের বললেন—আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাব।'[১০৩]

আরেকটি আয়াত তার করণীয়কে কেবল ইবাদতের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি স্রেফ আমার ইবাদতের জন্য। তাদের কাছে আমি রিযক চাই না। আর এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

[১০১] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭০

[১০২] সূরা আত-তিন, ৯৫ : ৪-৬

[১০৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৩০

আল্লাহই তো রিযকদাতা, ক্ষমতাশালী, মহাশক্তিমান।'[১৩৪]

এখানে إلا (ইল্লা—যা হারফুল ইসতিসনা বা ব্যতিক্রমীকরণ অব্যয়)[১৩৫] ব্যবহার করা হয়েছে। এই إلا (ইল্লা) যখন কোনো না-সূচকের পর আসে, তখন তা পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য পরবর্তী বাক্যকে সীমিতকরণ ও সীমাবদ্ধকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যকে ইবাদতকরণ উদ্দেশ্যের মাঝে সীমিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের দায়িত্বকে ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর এ আয়াতটি প্রতিনিয়ত ঘোষণা করছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবী-বিনির্মাণের জন্য এবং একে সংশোধন ও পরিশোধন করার জন্য। বোঝা গেল, পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করা, পৃথিবী-বিনির্মাণ করা এবং এর সংশোধন ও পরিচর্যা করাও ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইবাদত রয়েছে জীবনের প্রতিটি অংশে, পর্বে পর্বে। সালাত একটি ইবাদত, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ইবাদত, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা ইবাদত, আবার সালিশ-বিচারে ইনসাফ বজায় রাখাও ইবাদত, নারীদের জন্য ঢিলে-ঢালা জামা ব্যবহার করা ইবাদত, কেনাবেচায় সততা বজায় রাখা ইবাদত। ইবাদত আল্লাহর পথে লড়াই করা। খাবারদাবারও ইবাদত, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসাও ইবাদত। এমনকি প্রতিটি বাক্য, নড়াচড়া, আবেগ-অনুভূতি সবই ইবাদত; বরং প্রতিটি ভালো ও উত্তম নিয়্যাতই ইবাদত। আল্লাহর জন্য কারও সাথে বিদ্বেষ রাখাও ইবাদত। তবে এ সবকিছুর জন্য শর্ত একটি—সব কাজকর্মই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এমনভাবে করতে হবে, যেন সব কাজ আল্লাহর দিকে ফেরে, মহান রবের জন্যই একনিষ্ঠ হয়। কারণ, ইসলামি আকিদাহয় আমলের মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণিত হয় বিশ্বাসের প্রভাব থেকে, আমলের ফলাফল থেকে নয়। আমলের ফলাফল তো আল্লাহর হাতে।

মানুষের কর্মের প্রতিদান তাদের কর্মের ফলাফলের সাথে যুক্ত নয়। তাই কাজ করার সময়ে তার মন প্রবৃত্তির আত্মতৃপ্তি থেকে দূরে থাকবে। কর্মের ফলাফল ভোগের অপেক্ষায় থাকবে না (কী কী প্রতিদান পাবে তা ভাববে না)। এমনকি যদি তার হাতে দ্বীন বিজয়ের মতো বিষয়ও থাকে, তবুও সে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকবে না। আর এ কারণেই যেকোনো ভালো উদ্দেশ্যেও অবৈধ মাধ্যম ব্যবহারের বৈধতা নেই। তাই কোনো মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয় এবং বৈধও নয় যে, সে মহৎ কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অবৈধ কোনো পন্থায় অর্জন করবে। তাই তো কোনো সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষায় নকল করা বৈধ নয়, যদিও সে মনে করে এর মাধ্যমে সে ইসলামেরই সেবা করবে। কোনো

[১৩৪] সুরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬-৫৮

[১৩৫] কোনো কিছু 'ব্যতীত' বোঝাতে যা ব্যবহৃত হয়। যেমন سِوَى ,غَيْرُ , إِلَّا। [ভাষা-সম্পাদক]

কাফিরের মাল-সম্পদ চুরি করে মুসলিমকে সাদাকাহ (দান) করাও বিধিসম্মত নয়।

ইবাদত ও মুআমালাত

ইবাদত জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কেই শামিল করে। এখন আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই—ইবাদত ও মুআমালাতের মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি। যখন থেকে ফুকাহা কিরাম ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থ লেখা শুরু করেন, তখন থেকে এ অধ্যায়টি সবার শেষে সংযুক্ত হয়ে আসছে। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। ওই অধ্যায়টি গবেষণা ও শাস্ত্রগত কারণেই সবার শেষে সংযুক্ত হয়েছে। এই সংযুক্তিটি পাঠদানের জন্য অপরিহার্য ছিল, ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্যই ছিল সহজ-সরল। কিন্তু এই বিন্যাসরীতি ইসলামি জীবনে অসংখ্য বাজে প্রভাব রেখে যায়। এই রীতির কারণে মানুষের মন-মগজে বসে যায় যে, আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানগুলোই কেবল ইবাদত। কিন্তু মুআমালাত (লেনদেন) মুআশারাত (পারস্পরিক সম্পর্ক) কোনো ইবাদতই নয়। মুসলিমদের বড় একটি অংশের ভেতর এই কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে কেবল সালাতই ইবাদত। কিন্তু আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং সৎ ও কল্যাণের আদেশ করাও যে ইবাদত, তারা এটি যেন মানতেই চায় না। কুরআন-হাদিসে যত আদেশ বর্ণিত হয়েছে এবং যত বর্জনীয় কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ওইগুলো বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখাও ইবাদত। জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত। এমনকি এই জীবনব্যাপী মানুষের প্রতিটি কর্মতৎপরতাই ইবাদত। আর এগুলো তখনই ইবাদত হবে, যখন নিয়াত বিশুদ্ধ হবে, ইখলাসের সাথে করা হবে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই হবে। প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদের[১৩৬] অস্ট্রিয়ায় বেশ নাম-খ্যাতি রয়েছে। তিনি খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

> 'ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না যে, মানুষের জীবন অন্তঃসারশূণ্য একটি চলন্ত শল্কখণ্ড এবং পরকালের জীবন কিছু আবছা ও উদ্ভট কল্পনাবিলাসের সমষ্টিমাত্র। বরং জীবন সম্পর্কে ইসলামের মূল্যায়ন হলো, জীবন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিবাচক ঐক্য ও সংহতিব্যবস্থা। আল্লাহর ইবাদতের বিস্তৃতি ও পরিব্যাপ্তির কারণে মানবজীবনের সকল উদ্দেশ্য ও সারমর্মকে ইসলামের মাঝে সংযুক্ত করে নিয়েছে। আর এই একটি অনুভূতিই আমাদের বলে, এই পার্থিব জীবনের প্রতিটি পর্ব ও অধ্যায়ে

[১৩৬] মুহাম্মাদ আসাদ (Leopold Weiss) [০২ জুলাই, ১৯০০—২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২] : তৎকালীন লেম্বার্গ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি (বর্তমান লিভিভ, ইউক্রেন) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদিধর্মাবলম্বিত মুসলিম, একজন ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, ভ্রমণকারী, ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

মানুষ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। ইসলাম এই পূর্ণতাকে মানুষের দৈহিক সব চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনাকে লোপ করা পর্যন্ত প্রলম্বন করে না এবং ধারাবাহিক পুনর্জন্মের গাঁড়াকলেও ফেলে দেয় না। যেমনটা হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজ ধারণা করে। কিন্তু ইসলামের ইবাদতপদ্ধতি কেবল আমলের ভেতর বিনয় ও একনিষ্ঠ হবার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়—যেমন, সালাত বা সিয়ামের ভেতর বিনয় ও একনিষ্ঠ হওয়া—বরং ইবাদত মানবজীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মেকেই শামিল করে।'[১৩৭]

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

চলুন আমরা ইসলামি আকিদাহর বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনে এর প্রভাব জেনে নিই,

১. এই আকিদাহর সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও নির্বাচিত আকিদাহ। এর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হয়নি আর হবেও না। আর এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর এই তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে যে, এই আকিদাহই আমাদের আত্মার জন্য সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট। এই আকিদাহ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে সৌভাগ্য পদচুম্বন করে। আর এই আকিদাহ পরিত্যাগ করলে দুর্ভাগ্য ও বিনাশ পিছু নেয়।

ক. এই মহান আকিদাহর ওপর ভিত্তি করে যে শরিয়াহর বাস্তবায়ন ঘটে, কল্যাণ, বারাকাহ, সৌভাগ্য ও সৃষ্টির পূর্ণতা তাতেই।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'যদি জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত, তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান-জমিনের বারাকাহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে। তাই, আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।'[১৩৮]

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

[১৩৭] Muhammad Asad, Islam at the Crossroads

[১৩৮] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৬

'তারা (ইহুদি-খ্রিষ্টান) যদি তাওরাত ও ইনজিল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে যা (কুরআন) নাযিল হয়েছে সঠিকভাবে মেনে চলত, তারা তাদের ওপর ও পায়ের নিচ থেকে খাদ্যের যোগান পেত। তাদের কিছু লোক সৎপথের অনুসারী, আর অধিকাংশই মন্দ প্রকৃতির।'[১৩৯]

খ. আল্লাহপ্রদত্ত এই আকিদাহ ও মানহাজ (জীবনপদ্ধতি) চিরদিন থাকবে। এটি সব অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র এবং সব অন্যায়-অবিচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিরাপদ। আসমান-জমিনে আল্লাহর জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে আসত, তবে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[১৪০]

গ. যতদিন আল্লাহপ্রদত্ত এই আকিদাহ ও মানহাজ থাকবে, ততদিন তা মানুষের ইবাদতের স্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকবে। আল্লাহর মানহাজ ছাড়া কোনো কিছুই তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। কোনো দার্শনিক কাব্যশ্লোকও তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না, না পারবে কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা বা দাপট, আর না কোনো সম্পদের পাহাড়। ক্ষুধার এই প্রাকৃতিক যন্ত্রণা থেকে শুরু করে অতিশক্তি পর্যন্ত চোখের সামনে বিভিন্ন রকমের ক্লান্তি, দুর্যোগ ও অশুভ পরিণামের কাছে অকেজো ও বিকল হয়ে পড়ে। এই যে স্ট্যালিন[১৪১], সে দাবি করত ইলাহের কোনো অস্তিত্বই নেই, পুরো জীবনটাই বস্তুবাদ-নিয়ন্ত্রিত। আর ধর্ম জোঁকের মতো, যা প্রতিনিয়ত মানবজাতির রক্ত শুষে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতায় সে দুর্বল ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন

---

[১৩৯] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৬৬

[১৪০] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৮২

[১৪১] জোসেফ স্ট্যালিন (Joseph Stalin) [১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৮—৫ মার্চ, ১৯৫৩] : জর্জিয়ার গোরি শহরে জন্মগ্রহণ করে। জন্মনাম ইওসেব বেসারিয়নিস ডিজে জুগাশভিলি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে দীর্ঘতম নেতা হিসেবে ১৯২৪ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৯ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান নেতা ছিল স্ট্যালিন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয় (১৯২২-১৯৫২) স্ট্যালিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান (১৯৪১-১৯৫৩) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। প্রথমদিকে সম্মিলিত নেতৃত্বের অংশ হিসেবে দেশ পরিচালনা করলেও পরবর্তীকালে ১৯৩০-এর দশকে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। স্ট্যালিন সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা এবং দমনপীড়নের জন্য কুখ্যাত। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

স্ট্যালিন তার জন্য সাহায্যপ্রার্থনা করার জন্য অনেক পাদ্রীকে জেল থেকে বের করে আনে। আরেকবার সে ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়। তখন সে পাদ্রীর পেছন পেছন নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয় যেন প্রার্থনায় যোগ দিয়ে তার জন্য ক্ষমা চাইতে পারে।

ঘ. যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহপ্রদত্ত আকিদাহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সব মানুষ তার সামনে সমান ও সমমর্যাদার থাকবে। তাকওয়া ছাড়া কোনো অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব নেই। আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা এবং সবাই তাঁরই বান্দা। তিনি বর্ণবিশেষকে অন্য বর্ণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেন না। শ্বেতবর্ণের মানুষকে কৃষ্ণাঙ্গের ওপর মর্যাদা দেন না। অথচ আমেরিকার বিধানে এ বর্ণবৈষম্যই চলছে। আল্লাহর এই আয়াতের বিধানমতে কোনো পুরুষকেও নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'নারী অথবা পুরুষ যে কেউই ইমান আনয়নপূর্বক সৎকর্ম করবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দেবো। অবশ্যই তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দেবো।'[১৪২]

তবে উক্ত বিধান এই আয়াতের বিধানবিরুদ্ধ নয়,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (দায়িত্বের কারণে)। পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে (নারীদের জন্য)।'[১৪৩]

উভয় আয়াতের পার্থক্যবিধান বুঝতে হবে। আল্লাহ কারও সাথেই কোনো বিশেষ খাতির করেন না। নর-নারী সবাই তাঁর সৃষ্টি। কোনো স্তরবিশেষকেও তিনি অন্য স্তরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেন না। যেমন, অভিজাতশ্রেণির লোকদেরকে দাসশ্রেণির ওপর বিশেষ প্রাধান্যদানকরণ। কোনো জাতিগোষ্ঠী ও শ্রেণিবিশেষকে ভিন্ন শ্রেণির মানুষের ওপর বিশেষ মর্যাদা দেন না। যেমন, প্রাচীন আর্যশ্রেণি ও শ্বেতশুভ্র বর্ণের মানুষদের অন্যান্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বদানকরণ (যেমন বলা হয়, জার্মানিরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি)। অতএব,

[১৪২] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭

[১৪৩] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪

এটিই অনন্য ও একমাত্র আকিদাহ, যা মানুষের মাঝে ইনসাফের আলো ছড়ায়। মানুষ এ বিশ্বাসে পৌঁছুতে পারে যে, তাদের শাসক-শাসিত সবাই সমান ও সমমর্যাদার।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'তোমার রবের বাণীই সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। কেউ তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'[১৪৪]

২. এই মহান আকিদাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'অতএব, আপনি আল্লাহর স্বাভাবিক রীতিতে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যে রীতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।'[১৪৫]

কোনো আকিদাহর স্থায়িত্ব তখনই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যখন সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হবার সাথে সাথেই ওহি নাযিলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ কিয়ামাত পর্যন্ত বাকি থাকবে। একে রহিতকরণে আর কোনো কিছুই আসবে না। কোনো কাফিরও একে বিকৃত করতে পারবে না। মানবজাতি বিচরণ করতে থাকবে, উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে থাকবে এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে। কিন্তু এই আকিদাহর গণ্ডি মানবজাতির বিপ্লব-সংগ্রাম, উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে পরিবেষ্টন করে ঠিকই স্থির ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। যখন মানুষ এই অপরিবর্তনশীল আকিদাহ থেকে স্খলিত হয়, সে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ভেসে বেড়াতে থাকে। উদ্‌ভ্রান্ত তারার পরিণতি বয়ে বেড়ায়। এ পরিণতি তারাটিকে অন্য আরেকটি তারার সাথে সংঘর্ষে বাধ্য করে, পরিশেষে নিজে ধ্বংস হয়, অন্যটাকেও বিধ্বস্ত করে। মানুষের এমন একটি কেন্দ্র প্রয়োজন, যেখানে তারা ফিরে আসবে—যেন তারা আত্মপ্রশান্তি লাভ করতে পারে, আরাম ও আত্মতৃপ্তি বোধ করতে পারে। এটি তাদের জন্য একটি মানদণ্ড দেয়। এর মাধ্যমে সব বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ভর নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যারা বলে জীবনের সব বস্তুরই আধুনিকীকরণ হতে পারে—এমনকি দ্বীন, চরিত্র ও

[১৪৪] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১১৫

[১৪৫] সূরা রূম, ৩০ : ৩০

শৃঙ্খলা পর্যন্ত—তাদের এসব কথা বড় ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বয়ে আনবে। ফলে কোন বস্তুর ওপর কী হুকুম, কার ওপর কী বিধান, আমরা কখনোই সেটা বের করতে পারব না।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ব্যভিচারের কথাই ধরুন। এ কাজটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সকল দ্বীনেই নিষিদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারে দুজন ব্যক্তির মাঝেও কোনো দ্বিমত দেখা দেয়নি। অতএব, আমাদের কাছে যদি এমন কোনো মানদণ্ড থাকে, যা দিয়ে আমরা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে, এটা স্বীকৃত ঘৃণ্য কাজ, তাহলে ব্যভিচারের সেই নিকৃষ্টতা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্তরেও গেঁথে যাবে ব্যভিচারের এই বিধান স্থির ও অপরিবর্তনীয়। তবেই তাদের হৃদয় ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য নিয়ে বেড়ে উঠবে। কিন্তু কোনো আইনি প্রক্রিয়া ও ধর্মরীতি যদি অস্থিত এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল হয়, তাহলে ব্যভিচারের কদর্য ও নোংরামি কালের গণ্ডিতেই আটকে থাকবে। বর্তমানে যারা যৌন স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলে, তাদের পরিভাষায় ব্যভিচার জীববিজ্ঞানের অপরিহার্য অংশ (ফ্রয়েডের ভাষ্যমতে)। এমনিভাবে লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখা এবং পোশাক দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা, বিশেষ করে নারীশ্রেণির জন্য তো তা ছিল স্বভাবজাত বিষয়। সেই সাথে চারিত্রিক নিষ্কলুসতা ও দ্বীনদারিতায় স্বীকৃত বিষয় ছিল। আর কিয়ামাত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। উন্নত নৈতিকতাবোধ হিসেবে সব যুগ ও শতাব্দীতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত রাখা ছিল প্রশংসাযোগ্য রীতি। তারপর আসলো বিংশ শতাব্দী। তখনই পর্দার নান্দনিকতাকে কদর্য প্রথা হিসেবে উপস্থাপন শুরু হয়। এই শতাব্দীর মহারথীরা পর্দাবিধান উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গণমাধ্যমসহ উৎকট গন্ধ বের হওয়া ভেঁপু থেকে আওয়াজ তুলতে লাগল। তাদের ভেঁপুযন্ত্র দিয়ে বিশ্বদরবারে এই পবিত্র আবরণশিল্পের—যাকে তারা উচ্ছেদ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ওপর প্রতারণা ও হঠকারিতার দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল।

কিন্তু আমাদের স্থায়ী ও চিরন্তন আকিদাহ একটি সঠিক, নির্ভুল মানদণ্ড দেয়, যা মানুষকে পরিমাপ করে। কারণ, নিক্তি মাত্র একটি। এই নিক্তিতে থাকা বাটখারাটি বরাবর ১০০০ গ্রাম। আমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে ওজন করতে যাব, তাকে সেই পাল্লাতে রাখব আর তার বিপরীতে রাখব বাটখারাগুলো। এতে ব্যক্তির ওজন জানতে পারব। আর এভাবে সব মানুষকে ওজন ও পরিমাপ করাটা সঠিক ও নির্ভুল হবে। যেহেতু পাল্লা একটি, ওজনও একই হবে। পরবর্তীকালে যদি কখনো কোনো দল এসে এই নিক্তির নাম পাল্টিয়ে বলে এই কিলো মূলত কুইন্টাল,[১৪৮] তাহলে বিষয়টা এমন দাঁড়াল, সে নিজেকে প্রথমবার

[১৪৮] ১ কুইন্টাল=১০০ কেজি। [ভাষা-সম্পাদক]

সত্তর কেজি ওজন করল, আবার দ্বিতীয়বার মেপে সত্তর কুইন্টাল পেলো। কিন্তু ব্যক্তি ?
একজনই আর পাল্লাও একটাই। পাল্লা যদি ভিন্ন ভিন্ন ওজনের হয়, তাহলে না মাপ ঠিক
হবে, না হিসাব সঠিক আসবে।

মানুষের কাছে কোনো ব্যক্তি হয়তো সম্মানিত, অনুসরণীয় ও মর্যাদাবান হতে পারে।
কারণ, সে তাদের মানদণ্ডে অনেক ভারী। কিন্তু সে একই ব্যক্তিকে যখন আমরা আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডে পরিমাপ করব, তখন দেখা যাবে তার কোনো ওজনই নেই। যেমন ধরুন, ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাহ। কুরাইশরা তাকে নেতা ও কর্তৃত্ববান মনে করত আর বলত,

لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

'কেন এই কুরআন দুই জনপদের (মক্কা ও তায়িফ) কোনো এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হয় না?'[১৪৭]

কিন্তু আল্লাহ তার ব্যাপারে এবং তার মতো আরও যারা আছে তাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিচ্ছেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

'তুমি এমন ব্যক্তির কথামতো চলো না, যে অধিক শপথকারী, ইতর, গীবতকারী, কুৎসারটনাকারী।'[১৪৮]

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

'যারা কুফরি করে আল্লাহর কাছে তারাই নিকৃষ্ট জীব। অতএব, তারা ইমান আনবে না।'[১৪৯]

এমনকি তার পরামর্শ, অনুমতি ও উপদেশ ছাড়া কুরাইশরা কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্তগ্রহণ করত না; অথচ আল্লাহ তাকে চতুষ্পদ জন্তু বলে সম্বোধন করছেন। মুমিনরাও তাকে চতুষ্পদ জন্তু বলেই চেনে, বরং এ থেকেও নিকৃষ্ট বলে জানে।

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

---

[১৪৭] সুরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৩১

[১৪৮] সুরা আল-কালাম, ৬৮ : ১০-১১

[১৪৯] সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৫

'তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং এরচেয়েও বিভ্রান্ত।'[১৭৯]

৩. আকিদাহর মজবুতি মানুষের সামনে এমন একটি মূলনীতি তৈরি করে দেয়, যার দিকে সব মানুষ ফিরে যায়। তাদের শাসক থেকে শুরু করে জনসাধারণও তার সামনে সমান ও সমমর্যাদার হয়ে ওঠে। তখন মানুষ শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে, নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। শাসকেরা তাদের ওপর আর অন্যায়-অবিচার করতে পারে না। কারণ, শাসকশ্রেণি জনসাধারণের ওপর যুলম করার আগেই মানুষ তাদের ওপর প্রশ্ন তুলবে, তুমি কেন আইন ভাঙছ? আবার জনসাধারণও শাসকশ্রেণিকে বলতে পারবে না যে, আমরা দেশের আইন ও বিধিনিষেধ জানি না, এগুলো তো নতুন করে প্রণীত হয়েছে। যখন থেকে এই মূল উৎসটি মজবুতভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, তখন মানুষ মায়ের আঁচল থেকেই এর পরিচয় ও গুণাগুণ জানতে জানতে বড় হয়ে উঠবে। সব বিধিনিষেধ তাদের হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে থাকবে, তাদের অনুভূতিতে বিরাজমান থাকবে। আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীনে কোনো শাসক এই উদ্ভট দাবিও করতে পারবে না যে, উদ্ভূত সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতিগুলো একেবারেই নতুন, হঠাৎ হঠাৎ সংঘটিত হচ্ছে। এ কথাও বলতে পারবে না, সামরিক নীতিমালা ও আইনকানুনের জটিলতার কারণে আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োগ অনুপযোগী হয়ে গেছে। আর তাও হবে না যে, তারা এসব বক্তব্যের আড়ালে রক্তবন্যা বইয়ে দেবে, মানুষের সম্মান, সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হবে কিংবা দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা হবে।

মানবরচিত সব মতবাদের এটাই অবস্থা। বরং আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে বলতে হবে, এগুলো মূলত মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন বিদ্রোহ বা বিভিন্ন রকমের সামরিক আইন ও সেনা-বিধিনিষেধের মাঝে এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ মিলবে। যেমন, প্রতিটি নতুন নতুন বিপ্লব ও বিদ্রোহের পরপরই উদ্ভব হয় বিভিন্ন রকমের আইনকানুন। প্রত্যেকবারই তৈরি করা হয় ফাঁসির বিভৎস মঞ্চ। হাট-বাজারের খুঁটিতে খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তরতাজা দেহগুলো। আপনি যখন রাতের অন্ধকারে নারীদের সাথে নিজেকে সঁপে দেন, ঠিক তখন জীবিত মানুষগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় কিংবা পুরে দেয়া হয় নাইট্রিক এসিডের ব্যারেলে। অবশেষে দেহগুলো গলে যায়। পরবর্তী সময়ে পরিবারের কাছেই আবার তাদের খোঁজ করা হয়। কারণ, তারা তো জেল থেকে পালিয়েছে! এভাবে প্রতিটি বিপ্লবের পরই আইনকানুনের ভাঙাগড়া প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমন করে রাষ্ট্র তার সম্মানিত কীর্তিমান সন্তানদের হারায়, তার দক্ষ লোকবল নিঃশেষ হয়ে যায়। যত দামি উপাদান রয়েছে সব খুইয়ে বসে। অথচ যাদের হারিয়েছে, তারা ছিল জাতির শ্রেষ্ঠ

[১৭৯] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৭৯

সন্তান, আদর্শ তরুণদল, বড় বড় বুদ্ধিজীবী, কমান্ডারসহ নানা শ্রেণিপেশার নেতৃস্থানীয় লোক।

৪. আল্লাহপ্রদত্ত আকিদাহর দৃঢ়তা সকল মানুষকে একটি সংহত আইন ও শাসনের ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করে। সেখানে কোনো শাসক বা বিচারকই আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং জনসাধারণও আইন ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় না। বরং সেটি এমন এক আইন ও শাসনব্যবস্থা, যা জনসাধারণের মতো শাসক ও কর্তৃত্ববানদের ওপরও সমভাবে প্রয়োগ হয়। আল্লাহ হলেন ওই মহান সত্তা,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

> 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বরং তারা যা করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৫১]

খলিফাহ, বিচারক, শাসক সবাই আল্লাহর সৃষ্টি। তারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর পছন্দনীয় ও প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন করে। তারা যতদিন আল্লাহর সৃষ্টির গণ্ডিতে জীবনযাপন করবে, ততদিন আল্লাহর গোলাম হয়ে বেঁচে থাকবে। তারা এমন কোনো ইলাহ নয় যে, তাদের কাছে কোনো জবাবদিহিতা চাওয়া যাবে না বা কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। ইসলামের এই সুন্দর ঐতিহাসিক ঘটনাটিই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। একবার খলিফাতুল মুসলিমিন আলি ইবনু আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাযি শুরাইহের কাছে এক ইহুদির বিরুদ্ধে বর্ম চুরির অভিযোগ করেন। কাযি শুরাইহ ইহুদির পক্ষেই রায় দেন।[১৫২]

এখান থেকেই সব সুখ, আনন্দ ও প্রশান্তির চাদর শাসক থেকে শুরু করে সর্বসাধারণসহ সমাজ ও তার চারপাশকে আবৃত করে নেয়। এর সংস্রবে তারা সৌভাগ্যবান হয়ে ওঠে। কোনো শাসক বা কর্তৃত্ববান ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন ও আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না; পরিবর্তন-পরিবর্ধন তো অকল্পনীয় ব্যাপার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আইনকানুনের

---

[১৫১] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৩

[১৫২] ইমাম বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং : ২০৪৬৫; আবু নুয়াইম আসফাহানি, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৯, ১৪০। বর্ণনাটা দয়িফ জিদ্দান (মারাত্মক পর্যায়ের দয়িফ)। বাইহাকির সনদে আমর ইবনু শিমর ও জাবির ইবনু ইয়াযিদ ইবনিল হারিস উভয় বর্ণনাকারী 'মাতরুক' অর্থাৎ পরিত্যাজ্য এবং আবু নুয়াইমের দুই সনদের প্রথমটিতে হাকিম ইবনু খিযাম নামক রাবি 'মাতরুকুল হাদিস'; আর অপর সনদে আলি ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি মুয়াওয়িয়াহ 'মুত্তাহাম বিল ওয়াদয়ি' অর্থাৎ হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি। [নিরীক্ষক]

পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়-অবিচারের পথকে স্ফীত করে। তখন মানুষ আইনকানুনের এই রদবদল এবং সংবিধান সংস্কার ও সংযোজন-বিয়োজনের কারণে এক অস্থির বিষাদময় জীবন পার করে; যা আশপাশের অন্যান্য মানুষ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের আত্মিক দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতার চাইতেও অনেক অধৈর্যের। কারণ, মানুষ জানে ও বিশ্বাস করে, এই সব উদ্ভট বিধান ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। তাই এর আনুগত্য করা এবং এর সামনে নতিস্বীকার করা ইবাদত তো নয়ই বরং কুরআনুল কারিমে যেসব বিধিবিধান ও আইনকানুন বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর মানবরচিত বস্তুবাদী ব্যবস্থাকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রাধান্য দেয়া নির্ঘাত কুফরি এবং আল্লাহর প্রতি চরম অবিশ্বাস। আপনি আল্লাহর কালামের ওপর মানুষের কালামকে প্রাধান্য দিলেন, বরং মহাবিশ্বের প্রতিপালকের বিধানের ওপর প্রাধান্য দিয়ে দিলেন। যে-ই তা করবে, সে এই মহান দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহর দ্বীন ও জীবনব্যবস্থার আনুগত্যই ইবাদত। শাসকের হাতে আইনকানুন পরিবর্তনের যথেচ্ছ নির্বাহী ক্ষমতাপ্রদানের ফলে যেকোনো উপায়ে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে এবং ঘৃণ্যভাবে যৌনলালসা চরিতার্থ করতে শাসকও নিজ জনগণের প্রবৃত্তির লাগামকে উন্মুক্ত করে দেয়, বরং পাশবিক কামনাকে চরিতার্থ করতে তাদের অধিকার দিয়ে দেয়। আর এটা কোনোভাবেই হীন পশুবৃত্তির চেয়ে উন্নত মানসিকতা নয়। বিভিন্ন মতাদর্শ ও রীতিনীতি গজিয়ে ওঠার পেছনে এটাই স্বাভাবিক, যৌক্তিক ও বাস্তবিক কারণ। জনসাধারণের প্রবৃত্তি ও অবাধ ভোগের জন্য কোনো পাশবরীতির উদ্ভব ঘটানোর অর্থই হচ্ছে, তার অপর প্রান্তে ক্ষমতা ও শক্তির স্বেচ্ছাচারিতার অনিবার্য উদ্‌বোধন।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর পরিচয় : আকিদাহর মূল বুনিয়াদ

আল্লাহর সিফাত-পরিচিতি

আমরা জানি আল্লাহর নাম ও গুণগুলো তাওফিকি, অর্থাৎ শুধু ওহির ওপরই নির্ভরশীল—চাই তা কুরআন বা সুন্নাহ থেকে হোক। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ (মৃত্যু : ৩৮৬ হিজরি) বলেন,

> 'হিজায, তিহামাহ, ইয়ামান, শাম ও মিশরসহ আমাদের সব আলিম-উলামার মাযহাব হলো, আমরা আল্লাহর জন্য ওই সব গুণ সাব্যস্ত করি, যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। এ বিষয়টি আমরা মুখ দিয়ে স্বীকার করি, হৃদয় দিয়ে সত্যায়ন করি।'[১৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ
>
> 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, একটি কম একশতটি। যদি কেউ সেই নামগুলো হিফয (মুখস্থ) করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড় তাই বেজোড়কেই বেশি ভালোবাসেন।'[১৫৪]

এ ছাড়াও অন্যান্য হাদিসে আরও কিছু নাম এসেছে। তবে আল্লাহর নাম নিরানব্বইটির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। আবু বাকর ইবনুল আরাবি (রাহিমাহুল্লাহ) 'শারহুত তিরমিযি'তে একদল আহলুল ইলম (আলিম) থেকে বর্ণনা করেন—

[১৫৩] কিতাবুত তাওহিদ লি ইবনি খুযাইমাহ, পৃষ্ঠা : ২৬

[১৫৪] সহিহ বুখারি : ৬৪১০; সহিহ মুসলিম : ৬৯৮৫; শব্দাবলি বুখারির।

أَنَّهُ جَمَعَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى أَلْفَ اسْمٍ

'কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তাঁরা আল্লাহর একহাজার নাম ও গুণ আহরণ করেছেন।'[১৫৫]

ওইসব নামের মাঝে রয়েছে—الحنان (হান্নান), المنان (মান্নান), البديع (বাদি), الكفيل (কাফিল) ইত্যাদি। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কিছু গুণ,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।'[১৫৬]

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

'যারা তোমার কাছে বাইয়াত করে, বস্তুত তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।'[১৫৭]

সিফাতের মাসআলায় চারটি মাযহাব (মত ও পন্থা)

আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে মানুষ চারটি মাযহাবে বিভক্ত :

▪ মুশাব্বিহাহ (সাদৃশ্যবাদী) বা মুজাসসিমাহ (দেহবাদী)

তারা আল্লাহর জন্য গুণ সাব্যস্ত করে ঠিকই কিন্তু তারা বলে, আমাদের হাতের মতো আল্লাহর হাত রয়েছে, আমাদের চোখের মতো তাঁরও চোখ রয়েছে, আমাদের মুখের মতো তাঁরও মুখমণ্ডল রয়েছে। এরা হলো দাউদ আল-জাওয়ারিবি, হিশাম ইবনুল হাকাম আর-রাফিদি। এটা মূর্তিপূজার মতোই। এটা কুফর। এ ধরনের আকিদাহ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে বলে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১৫৮]

---

[১৫৫] উসতায হাসানুল বান্না, আল-আকায়িদ, মাজমুয়াতুর রাসায়িল, পৃষ্ঠা : ৯৮৪

[১৫৬] সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৭

[১৫৭] সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১০

[১৫৮] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১১

▪ মুয়াত্তিলাহ[১৫৯] ও জাহমিয়াহ[১৬০]

এরা আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা, আল্লাহ শুনতে পান না, কথা বলতে পারেন না এবং দেখতেও পারেন না। কারণ, এসব কাজ তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এই ফিরকাটি নির্ঘাত কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ। সালাফরা বলেন,

> 'মুয়াত্তিলারা অস্তিত্বহীনতার পূজা করে আর মুমাসসিলারা (সাদৃশ্যবাদী) মূর্তির পূজা করে।'[১৬১]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'শিরকের মূল উৎস তাতিল। এর ওপর ভিত্তি করে শিরক মাথাচাড়া দেয়। এই তাতিল তিন প্রকারে বিভক্ত,

১. স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে তাতিল (নিষ্ক্রিয়) করা।
২. আল্লাহকে তাঁর পবিত্র নাম, গুণ ও কর্ম থেকে তাতিল (নিষ্ক্রিয়) করা।
৩. বান্দার ওপর তাওহিদের হাকিকাত আবশ্যকের কারণে আল্লাহ বান্দার সাথে যে মুআমালা (ব্যবহার) করেন বা করবেন, তা থেকে আল্লাহকে তাতিল (নিষ্ক্রিয়) করা।'[১৬২]

▪ সালাফদের আকিদাহ : ইসবাত (সাব্যস্তকরণ)

এই আকিদাহর মূল ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহর গুণগুলো ওইভাবেই প্রয়োগ করা, যেভাবে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে। যখন এ ধরনের আয়াতের মুখোমুখি হন—يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

---

[১৫৯] যারা তাতিল করে তাদের মুয়াত্তিলাহ বলা হয়। তাতিল (تعطيل) অর্থ শূন্যকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ। পরিভাষায় আল্লাহর কোনো নাম বা সিফাতকে অস্বীকার করা। জাদ ইবনু দিরহাম সর্বপ্রথম তাতিলের সূচনা করে। (দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাবিয়াহ) [ভাষা-সম্পাদক]

[১৬০] জাহম ইবনু সাফওয়ানের (মৃত্যু : ১২৮ হিজরি) অনুসারীদের জাহমিয়াহ বলা হয়। তার নামানুসারেই এই সম্প্রদায়ের নামকরণ। বনু উমাইয়াদের শাসনামলের শেষদিকে খুরাসান অন্তর্গত সমরকন্দ থেকে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। এরা আল্লাহর সকল নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করে। এদের মতে ইমান কেবল অন্তরে জানার নাম। মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলকে এরা ইমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। [ভাষা-সম্পাদক]

[১৬১] মাজমুউল ফাতাওয়া : ৫/২১৬

[১৬২] আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ১০

يَدُ اللَّهِ (আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর)[১৬৩] তখন তাঁরা বলতেন, আমরা হাতকে সাব্যস্ত করি, এর প্রতি ইমান রাখি ও সত্যায়ন করি। কিন্তু আমরা এর কাইফিয়াত (ধরন) নিয়ে প্রশ্ন করি না, আবার অস্বীকারও করি না। ইমাম খাত্তাবি (মৃত্যু : ৩৮৮ হিজরি) এই আকিদাহর একটি সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। একখণ্ড সংক্ষিপ্ত মজবুত ভাষ্যে এর ওপর দলিল উপস্থাপন করেছেন। বক্তব্যটি চমৎকার, সুসংক্ষিপ্ত। আমি এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

> 'সালাফদের মাযহাব হলো, তাঁরা গুণসংক্রান্ত সব আয়াত ও হাদিসকে এর প্রকাশ্য অর্থের ওপর প্রয়োগ করতেন। সাথে সাথে কাইফিয়াত (ধরন) ও তাশবিহ (সাদৃশ্যকরণ) অস্বীকার করতেন। আল্লাহর সিফাতের ওপর কালাম প্রয়োগ করা মূলত তাঁর মহান সত্তার ওপর কালামের ধারা চালু করার নামান্তর। কারণ, আল্লাহর সত্তার মাঝে যুক্তির পেছনে পড়লে শেষ পর্যন্ত তার সাদৃশ্যের পেছনেও পড়তে হয়। যেহেতু আল্লাহর সত্তাকে সাব্যস্ত করার মানে আল্লাহর অস্তিত্বকেই সাব্যস্ত করা, তাই তাঁর গুণ সাব্যস্ত করার মানেও হলো তাঁর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা। এটি কোনো ধরনের ধরন সাব্যস্তকরণ নয়। তাঁরা বিষয়টিকে নিজেদের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করতেন যে, গুণগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই প্রয়োগ হবে। কোনোরকম তাওয়িলের (দূরবর্তী ব্যাখ্যা) পেছনে পড়া যাবে না। এ কথার মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, ধরন-বর্ণনা করা ছাড়াই আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে হবে। সালাফদের দিকে সম্বন্ধকারী কিছু লোক ধারণা করে যে, সালাফরা এই কথার মাধ্যমে তাফউইদ (সিফাতের অর্থ না-জানার দাবি, অর্থাৎ সিফাতের অর্থ আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা) উদ্দেশ্য নিয়েছেন অথবা তাদের ধারণা, এগুলো মুতাশাবিহাতের (অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক) অর্ন্তভুক্ত। এ সবই ভুল ধারণা।'[১৬৪]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের অন্যতম অংশ হচ্ছে, নিজ কিতাবে তিনি নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, কোনো প্রকার তাহরিফ, তাতিল, তাকয়িফ এবং তামসিল ছাড়াই এর ওপর ইমান আনা।'[১৬৫]

---

[১৬৩] সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১০

[১৬৪] রাওদাতুন নাদিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৩২

[১৬৫] আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৮

এবং কেউ কেউ বলেছেন,

> 'সামগ্রিকতা ও সাব্যস্তকরণের দিক থেকে আল্লাহর গুণগুলোর অর্থ জানা আছে, তবে ধরন-নির্ধারণ ও সীমাবদ্ধকরণের দিক থেকে তা একেবারেই অবোধগম্য।'[১৬৬]

তাহরিফ (বিকৃতিসাধন) : কোনো নসকে (কুরআন-হাদিস) শব্দগত বা অর্থগতভাবে বিকৃত করা।

তাকয়িফ (ধরন-নির্ধারণ) : كيف শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা। অর্থাৎ এটি কেমন বা কী ধরনের, এ জাতীয় প্রশ্ন করা।

তামসিল (তুলনাকরণ) : কোনো বস্তুর জন্য অন্য একটি বস্তুকে সাদৃশ্যপ্রদান করা, যে বস্তুটি সবদিক থেকে তার মতো হয়।

তাশবিহ (সাদৃশ্যকরণ) : কোনো একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা, তবে সে বস্তুটি কিছু কিছু দিক থেকে তার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

ইমাম আবুল কাসিম আল-লালাকায়ি 'উসুলুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

> 'দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত যত ফুকাহা কিরাম রয়েছেন সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, কুরআনের ওপর ইমান আনতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীরা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যাখ্যা, ভিন্ন কোনো বিশেষণব্যবহার ও সাদৃশ্যস্থাপন ছাড়াই ওইসব হাদিসের ওপরও ইমান আনতে হবে। আজকের জমানায় কেউ যদি ওগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথের ওপর ছিলেন তা থেকে বের হয়ে গেল এবং সাহাবা আজমায়িনের জামাআত ত্যাগ করল। তাঁরা তো ভিন্ন কোনো বিশেষণ ব্যবহার করেননি, ব্যাখ্যাও করেননি; বরং কুরআন-সুন্নাহয় যা আছে তার ওপরই ফাতওয়া দিয়েছেন, তারপর চুপ থেকেছেন।'[১৬৭]

[১৬৬] শাইখ মুসতাফা আল-আলিম, শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১২

[১৬৭] শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ, পৃষ্ঠা : ১৮৬

ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'তাঁর হাত, মুখ ও সত্তা রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ কুরআনুল কারিমে বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ যে চেহারা, হাত ও সত্তার আলোচনা করেছেন, সেগুলো কোনো প্রকারের ধরন-নির্ধারণ ছাড়াই তাঁর সিফাত (গুণ)। তাঁর হাতকে কুদরাত (ক্ষমতা) বা নিয়ামাত বলা যাবে না। এমন ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর গুণ বাতিল করে দেয়া। এমন ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মুতাযিলাদের মাযহাব[১৬৮]; বরং হাত তাঁর সিফাত, কোনো ধরন-নির্ধারণ ছাড়া।'[১৬৯]

আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন[১৭০] এবং আল্লাহ তাঁর পা রাখেন, এ ধরনের নসের (কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা) ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'আমরা এর ওপর ইমান আনি, সত্যায়ন করি, তবে এগুলোর কোনো ধরন নেই, কোনো অর্থও নেই।[১৭১] আমরা এগুলোর কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করি

---

[১৬৮] মুতাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হলো ওয়াসিল ইবনু আতা ও আমর ইবনু উবাইদ। তাদের দুজনকেই হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ কুফার মসজিদে নিজ হালাকা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বনু উমাইয়াদের আমলে এদের সূচনা হলেও আব্বাসীয় খলিফাহ মামুনের যুগেই এদের বিশেষ উত্থান ঘটে। মামুন এদের সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। মুতাযিলারা নিজ বিবেক-আকলকে ওহির ওপর প্রাধান্য দিত, আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করত। তাদের মতে কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক। তারা বলত, কবিরা গুনাহকারী মুমিনও নয়, কাফিরও নয়; বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী। এরা মুজিযায় বিশ্বাস করত না। [ভাষা-সম্পাদক]

[১৬৯] আল-ফিকহুল আকবার, পৃষ্ঠা : ১৬৭-১৬৮ (দারুল কিতাব, বৈরুত, হিজরি : ১৩৯৯)

[১৭০] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের মহামহিম রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে ঘোষণা করতে থাকেন, "কে আছে ডাকবে আমি সাড়া দেবো? কে আছে কিছু চাইবে আমি দেবো? কে আছে ক্ষমা চাইবে আমি ক্ষমা করবো?"' (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাহাজ্জুদ : ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কাসরিহা : ৭৫৮) [ভাষা-সম্পাদক]

[১৭১] ইমামের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আবু বাকর আল-খাল্লাল (মৃত্যু : ৩১১ হিজরি) থেকে বর্ণিত যে, হাম্বল ইবনু ইসহাক বলেছেন,

سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وإن الله يضع قدمه وما أشبهه فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى

'আবু আবদিল্লাহকে (আহমাদ ইবনু হাম্বল) ওইসব হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যেগুলো এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, আল্লাহকে দেখা যাবে এবং তিনি তাঁর পা রাখেন ইত্যাদি। তখন তিনি বললেন, "আমরা এর ওপর ইমান আনি,

না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন—যদি সহিহ সনদ

সত্যায়ন করি। তবে এগুলোর কোনো ধরন নেই, কোনো অর্থও নেই।"' (ইমাম ইবনু কুদামাহ, যাম্মুত তাওয়িল, পৃষ্ঠা : ২২; বর্ণনা নং : ৩৩)।

সনদগত আলোচনা : বর্ণনাকারী হাম্বল ইবনু ইসহাকের ব্যাপারে রিজালশাস্ত্রের ইমামদের মন্তব্য হলো, কোনো বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁর ভ্রম হতো। অনেক মাসআলা বর্ণনায় তিনি এককভাবে অদ্ভুত ও অপরিচিত কথা বর্ণনা করেছেন। তাই ইমাম আহমাদ থেকে তাঁর একক কোনো বর্ণনা মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তী) হাম্বলিরা নেননি। ইমাম যাহাবি 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'য় বলেছেন, তিনি প্রচুর মাসআলায় ইমাম আহমাদ থেকে এককভাবে অদ্ভুত ও অপরিচিত কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনু রজবও একই কথা বলেছেন। এমনকি আবু বাকর খাল্লালও তাঁর একক কোনো বর্ণনা নিতেন না। বর্ণনাটা প্রকৃতপক্ষে শায (ইবনুল মুসিলি, মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালাহ লি ইবনিল কাইয়িম, পৃষ্ঠা : ৪৭৫)।

দৃষ্টি আকর্ষণ : এই বর্ণনায় ইমাম আহমাদকে যে কয়টি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, এর একটি হলো, আল্লাহকে দেখতে পারা। আহলুস সুন্নাহর সবাই একমত, পরকালে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা যাবে। গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। কিন্তু ইমামের 'অর্থ নেই' কথাটাকে যদি অর্থের তাফউইদ ধরা হয়, তাহলে তো আল্লাহকে দেখতে পারার বিষয়টিও নাকচ করে দিতে হবে। কারণ, এর তো কোনো অর্থই নেই। অথচ বিষয়টি আদৌ এমন নয়। এর সনদগত ত্রুটি সত্ত্বেও বর্ণনার ভাষ্যটা অর্থ ও ধরন নাকচ বোঝায় না। বরং তৎকালীন জাহমিয়াদের বিকৃতি ও ধরন-বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করে কথাটা বলা হয়েছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ 'দারউত তাআরুদ'-এ ইমাম আহমাদের উপর্যুক্ত বক্তব্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে,

ولا كيف ولا معنى؛ أي: لا نُكيِّفها، ولا نُحرِّفها بالتأويل، فنقول: معناها كذا

'"কাইফ নেই" কথাটার অর্থ হলো, আমরা কোনো ধরন সাব্যস্ত করতে যাই না। আর "অর্থ নেই" কথার অর্থ হলো, তাওয়িল করে আমরা সিফাতকে বিকৃত করি না। বরং আমরা বলি, এর অর্থ হলো এটি।' (দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকলি : ২/৩১)।

প্রকাশ্য অর্থে সিফাত সাব্যস্তকরণ : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان؟

'আল্লাহ কি সাত আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর আরশের ওপর, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র?' তিনি জবাবে বললেন,

نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه

'হাঁ, তিনি তাঁর আরশের ওপর, কোনোকিছু তাঁর জ্ঞানের অগোচরে নয়।'

(ইমাম লালাকায়ি, শারহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০১, বর্ণনা নং : ৬৭৪)।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল আরও বলেছেন,

إن لله تعالى يدان وهما صفة له في ذاته

'মহান আল্লাহর দুই হাত রয়েছে। এ দুই হাত তাঁর সত্তাগত সিফাত।

> তা বর্ণিত হয়—সবই সত্য। আমরা তার কোনো কথাই প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যে সিফাত বর্ণনা করেছেন—সীমা ও পরিসীমা ছাড়াই—এরচেয়ে বেশি ও বাড়িয়ে বর্ণনা করা করা যাবে না। তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই।'[১৭২]

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর)[১৭৩] তখন তিনি নিজের হাতের দিকে ইশারা করতেন। অথবা যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)[১৭৪] তখন তিনি নিজের চোখ ও কানের দিকে ইশারা করতেন। কারণ, এই ইশারাকৃত অঙ্গের সাথে সাদৃশ্য দিলে তা কেটে দেয়া হবে। এ তো নিজের সাথে আল্লাহকে তুলনা করার নামান্তর।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'হাত ও চেহারা আমাদের কাছে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য। তা মৌলিকভাবেই জ্ঞাত, তবে বর্ণনা করার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই, কাইফিয়াত (ধরন) বর্ণনা করা থেকে অক্ষম হওয়ার কারণে সিফাত বাতিল করা যাবে না। মুতাযিলারা এই জন্যই পথচ্যুত হয়েছে। তারা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সিফাত সম্পর্কে না-বুঝতে পেরে মূল সিফাতগুলোই প্রত্যাখ্যান করে বসে। ফলে মুয়াত্তিলাহগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।'[১৭৫]

- **পরবর্তীদের (খালাফ) আকিদাহ**

এই মতের অনুসারীরা আল্লাহকে দেহবাদের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কিছু গুণকে ব্যাখ্যা করা বৈধ মনে করতেন। তবে তারা এ ব্যাপারে সালাফদের সাথে একমত যে, আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য এমনসব অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিপরীত, যা মানুষের মাথায় আসে। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ বলেন,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-আকিদাহ, আবু বাকর খাল্লালের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ১০২-১১১) [নিরীক্ষক]

[১৭২] ফিকহুল আকবর, পৃষ্ঠা : ১১৫

[১৭৩] সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১০

[১৭৪] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১১

[১৭৫] উসূলুদ দ্বীন, পৃষ্ঠা : ৪১

"ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।"[১৭৬]

মুফাসসিরে কিরাম বলেন, এর অর্থ হলো "তোমার রব বাকি থাকবেন।" এমনিভাবে তাঁরা আল্লাহর বাণী يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (তারা আল্লাহর চেহারা কামনা করে)-এর তাফসির করেছেন, يريدونه (তারা আল্লাহকে চায়)। এমনিভাবে দাহহাক ও আবু উবাইদাহ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু তাঁর চেহারা ছাড়া) আয়াতের তাফসির করেছেন إِلَّا هُوَ (তিনি ছাড়া)।'

ইমাম ইবনুল জাওযি (রাহিমাহুল্লাহ) মনে করতেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদের অন্তর্ভুক্ত। শব্দের প্রকাশ্য অর্থের জন্যই তো শব্দটিকে গঠন করা হয়েছে। সুতরাং يد (হাত) শব্দটির হাকিকি (প্রকৃত) অর্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (جارحة) ছাড়া অন্য কিছুই বুঝে আসে না। তিনি বলেন,

> 'সালাফদের মানহাজ হচ্ছে, এসব আয়াতের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা। তাঁরা কখনোই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করতেন না।'[১৭৭]

আমাদের আকিদাহ

সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাবই আমাদের মাযহাব। এ ব্যাপারে আমরা সালাফদের আকিদাহই গ্রহণ করেছি। যার সারমর্ম হলো, কোনো প্রকার তাওয়িল (দূরবর্তী ব্যাখ্যা), তাতিল (নিষ্ক্রিয়করণ), তাহরিফ (বিকৃতি), তাকয়িফ (ধরন-নির্ধারণ) তামসিল (সাদৃশ্যকরণ) ছাড়াই আল্লাহর সুমহান গুণসহ তাঁর নাম একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা। আমাদের বিশ্বাস, সালাফরা গুণগুলো সাব্যস্ত করতেন, তাফউইদ (সিফাতের অর্থ না-জানার দাবি, অর্থাৎ সিফাতের অর্থ আল্লাহর কাছে ন্যস্তকরণ) করতেন না। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক)[১৭৮] মনে করতেন না; বরং তাঁরা ওগুলোর অর্থ জানতেন, কিন্তু ধরন নিয়ে প্রশ্ন করতেন না।

আমরা এ ব্যাপারে ওই কথাই বলব, যা ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

---

[১৭৬] সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৭

[১৭৭] দাফয়ু শুবাহিত তাশবিহ, পৃষ্ঠা : ১৫৩

[১৭৮] মুতাশাবিহের অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআনের বিচ্ছিন্ন হারফগুলো (হুরুফুল মুকাত্তাআত) মূলত মুতাশাবিহাত। যেমন, ত্বা-সিন, আলিফ-লাম-মিম ইত্যাদি। এগুলো সর্বসম্মতভাবেই মুতাশাবিহ। আল্লাহ ছাড়া এগুলোর অর্থ কেউ জানে না। [ভাষা-সম্পাদক]

الْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ ، وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ

'ইসতিওয়া (আরশের ওপর সমুন্নত হওয়া) জানা বিষয়, তবে ধরন অজ্ঞাত। এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, প্রশ্ন করা বিদআত।'[১৭৯]

আমরা ইসতিওয়াকে প্রভাব বিস্তারকরণ বা ক্ষমতাগ্রহণ অর্থ করব না। আল্লাহর অবতরণের (নুযুল) বেলায়ও একই কথা। একইভাবে আমরা বলব, তাঁর হাত রয়েছে, তবে আমাদের হাতের মতো নয়। আবার তাঁর হাতকে আমরা ক্ষমতাও (কুদরাত) বলব না। আমরা বলব—

مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَحْكَمُ

'সালাফদের পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাময়।'

এ কথা বলব না যে,

مَذْهَبُ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَ مَذْهَبُ الْخَلَفِ أَحْكَمُ

'সালাফদের পন্থা সর্বাধিক নিরাপদ, আর খালাফদের পন্থা সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।'

আমরা বলি, সালাফদের মাযহাবই (পন্থা) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাব। তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। পরবর্তীকালের কিছু আলিম তাওয়িলের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, আশআরি সম্প্রদায়। তারাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। তবে সিফাতের তাওয়িলের (দূরবর্তী ব্যাখ্যা) ক্ষেত্রে তারা

---

[১৭৯] ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তিটি একাধিক সনদে বর্ণিত। কিছু সূত্রে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হলেও সবগুলোর মর্মার্থ একই। এর কিছু সনদে দুর্বলতা থাকলেও ইমাম মালিকের প্রায় দশজন ছাত্র থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ায় দুর্বলতা কেটে গেছে। কয়েকটি বর্ণনা তো সহিহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে। সহিহ সনদের একটি বর্ণনা,

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

'ইসতিওয়া অজ্ঞাত নয়, তবে এর ধরন অবোধগম্য। এর প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, প্রশ্ন করা বিদআত।' (ইমাম আল-বাইহাকি, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত : ৮৬৭ নং বর্ণনা; ইমাম আল-বাইহাকি, আল-ইতিকাদ, অধ্যায় : আল-কওলু ফিল-ইসতিওয়া, পৃষ্ঠা নং : ১১৬)।

এটি ইমাম মালিক থেকে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আত-তামিমি সরাসরি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকি নিজ সনদে তা উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবি বলেন—ইমাম মালিক থেকে এ বর্ণনা প্রমাণিত। (আল-উলু : ৩৭৮ নং বর্ণনা)। ইমাম মালিক থেকে অনুরূপ শব্দে মুহাম্মাদ ইবনু নুমান ইবনি আবদিস সালাম আত-তাইমিও বর্ণনা করেছেন—তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন, অধ্যায় : ৭ম তাবাকাহ, বর্ণনা নং : ১৫৪। এই সনদ জাইয়িদ (ভালো)। [নিরীক্ষক]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত নন। আমাদের বিশ্বাস আশআরিরা কাফির নন, তাওয়িলের কারণে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজও নন; বরং তারা এ ব্যাপারে ভুল করেছে। বিশেষ করে ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য আলিম-উলামা তাওয়িল করেছেন। তাদের বড় অংশজুড়েই ছিলেন ফিকহ, তাফসির ও ইলমুল হাদিসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও মহান কীর্তিমান সন্তান। সাদৃশ্যবাদ থেকে আল্লাহকে পবিত্র রাখাই তাওয়িলের প্রতি তাদের ঝুঁকে যাবার কারণ।[১৮০] আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পদস্খলিত ও পথচ্যুতদের ক্ষমা করেন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

'ও রব, পথপ্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দেবেন না। আপনার পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই তো মহানদাতা।'[১৮১]

তা ছাড়া অসংখ্য সত্যবাদী ব্যক্তি সালাফদের আকিদাহয় ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মাঝে অন্যতম হলেন আবুল হাসান আশআরি। তিনি এর আগে মুতাযিলাদেরও নেতা ছিলেন। সেই ভ্রান্তি থেকে ফিরে এসে মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে তিনশতেরও বেশি বই-বই রচনা করেন। তিনি তাঁর 'আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ' এবং 'মাকালাতুল ইসলামিয়িন' গ্রন্থদ্বয়ে নিজ আকিদাহর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

'আমাদের আকিদাহর সারকথা হলো, আমরা আল্লাহকে স্বীকার করি, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব ও রাসুলদের স্বীকার করি। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেগুলোও স্বীকার করি এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা যা বর্ণনা করেছেন, তাও স্বীকার করি। আমরা এর কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহর চেহারা রয়েছে। তিনি বলেছেন,

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

---

[১৮০] মূলত আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে জাহমিয়া ও মুতাযিলাদের ভ্রান্তি খণ্ডন করতে গিয়েই তারা তাওয়িল করেছিলেন। তা একটি সময়ে নির্দিষ্ট একটি কারণকে সামনে রেখেই করা হয়েছিল। যদিও এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতো অন্যান্য সালাফের নীতি ছিল একদম বিশুদ্ধ যে, তাওয়িল করে ওদেরকে মানাতে বাধ্য করা আমাদের দায়িত্ব নয়; বরং নুসুসে যা যেভাবে আছে, সেভাবেই বলে যেতে হবে। যেহেতু নির্দিষ্ট একটি কারণকে সামনে রেখে তারা এমনটা করেছিলেন, তাই তাদের উক্ত কাজ স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিশেষ করে এ সাময়িক কাজ একচ্ছত্রভাবে গ্রহণ করা সুস্পষ্ট পদস্খলন, যা আহলুস সুন্নাহ ও সালাফের মানদণ্ড-বহির্ভূত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। [নিরীক্ষক]

[১৮১] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮

"ধ্বংস হবে না কেবল তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।"[১৮২]

তাঁর দুই হাত রয়েছে, তবে ধরন-নির্ধারণমুক্ত। আল্লাহ বলেন,

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

"আমি আমার উভয় হাত দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছি।"[১৮৩]

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

"বরং তাঁর উভয় হাত বিস্তৃত হয়ে আছে।"[১৮৪]

এমনিভাবে তাঁর দুই চোখ রয়েছে, তবে ধরন-নির্ধারণমুক্ত। তিনি বলেন,

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

"(নৌকাটি) আমার চোখের সামনে ভ্রমণ করবে।"[১৮৫],[১৮৬]

[১৮২] সুরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৭

[১৮৩] সুরা সাদ, ৩৮ : ৭৫

[১৮৪] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৬৪

[১৮৫] সুরা আল-কামার, ৫৪ : ১৪

[১৮৬] আল-ইবানাহ, পৃষ্ঠা : ২১-২২

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি : আকিদাহর স্তম্ভ

দাসত্বের প্রথম শর্ত : আল্লাহর শরিয়াতের কাছেই সব ফায়সালা অর্পণ

বর্তমান মানবজাতি যেসব দুরবস্থা অতিক্রম করছে, যেসব জটিল পথপরিক্রমা দিয়ে মানুষ চলাচল করছে, মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই হয়েছে আল্লাহর কিতাবের কাছে নিজেদের বিচার-ফায়সালাকে না-ফেরানোর কারণে। কুরআনের কাছে সব বিচারকাজ ন্যস্ত করা কোনো নফল কাজ নয়, বরং তা ইমানের অন্যতম অংশ। এটি মানবজাতির দুঃখ-কষ্টের একমাত্র চিকিৎসা। এ বিষয়ের অনুপস্থিতি মানে ইমানই অনুপস্থিত। কুরআনুল কারিমে এসেছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়[১৮৭]

এই আয়াত আমাদের এই মহান দ্বীনের বড় এক মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। আর এই মূলনীতি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এ ছাড়া ইমান ও ইসলামই মূল্যহীন। যেদিন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিন থেকে এটি মুসলিমদের মূল ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল। এটিই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি বিষয়। সব যুগেই এমন হওয়া উচিত। এটি বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় বিষয়, যার দিকে সব মুসলিমের চিন্তা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সব বিচারকাজকে কুরআন-সুন্নাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত করার নামই ইসলাম। কুরআনুল কারিমের এ আয়াতটি এমন কম্পনধরানো বক্তব্য তুলে ধরছে, যার

[১৮৭] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

সামনে মানুষের শরীরের জোড়া-উপজোড়া শিউরে ওঠে। যা শুনলে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পাহাড়-পর্বতও। এটি ধ্রুব সত্য, ধারণা ও কল্পনার চেয়ে বহুগুণে স্পষ্ট, যা মানুষের হৃদয় থেকে কখনো অদৃশ্য হয় না এবং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বিস্মৃত হয় না। আর তা এ জন্যই যে, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই সাম্রাজ্যে বসবাস করি। আমরা তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি থেকে একপ্রকার সৃষ্টিমাত্র। তাই তাঁর বিধান আমাদের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাঁর বিধান আমাদের মাঝে প্রয়োগ করতে হবে। নয়তো যেকোনো বিধানই পৃথিবী ও মানবজাতির স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারে। আর এমন ঘটলে তা হবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর বিনা অনুমতিতে বৈরী আচরণ; বরং মালিকের রাজ্য, নিয়মনীতি এবং দাসদের নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধেই শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। এ হবে মহাবিশ্বের মহিমান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ—যিনি আপন রাজত্বে যেভাবে চান, সেভাবেই হস্তক্ষেপ করেন—তাঁরই সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া, পরিশেষে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে বসা।

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

> 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বরং তারা যা করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৮৮]

আল্লাহর দ্বীন তাঁর সব আদেশ-নিষেধের সমষ্টি। যেভাবে ইবাদত-বন্দেগিসহ সব বিধিবদ্ধ কাজকর্ম ইসলামের শাআয়ির[১৮৯] বাস্তবায়নের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়, শরিয়াত ও সার্বিক বিধানের মাঝে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহর দ্বীন আকিদাহর সবদিকে মুড়িয়ে থাকে। শরিয়াতের প্রতিটি দিক যেভাবে পরিপূর্ণ, এগুলোর কোনো অংশ যদি চ্যুত হয় বা ব্যাহত হয়, তাহলে এই দ্বীন তার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে অনেক পিছিয়ে যাবে। ইসলাম তো ওইসব যন্ত্রাংশের মতো গভীরভাবে সংযুক্ত, যার কোনো একটি অংশ যদি খুলে নেয়া হয় বা তার গঠনবহির্ভূত নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই যন্ত্রটি একেবারেই বিকল ও অকেজো হয়ে পড়ে।

আল্লাহর জন্যই অনন্য অতুলনীয় ও সর্বোন্নত উপমা। মহান রবের দ্বীন কখনোই মানবপ্রসূত জীবনধারার সাথে একত্রে বাস করতে পারে না এবং নিজ রং ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। এই দ্বীনের সর্বশেষ অধ্যায়ও শরিয়াতের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, যা অবতীর্ণ

---

[১৮৮] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৩

[১৮৯] শাআয়ির (شعائر) শব্দটি শায়িরাতুন (شعيرة)-এর বহুবচন। শায়িরাতুন (شعيرة) হলো প্রতীক, চিহ্ন, নিদর্শন। সুতরাং দ্বীনের শাআয়ির হলো এমন কিছু বস্তু, আমল বা স্থান যা আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং যা দ্বীনের নিদর্শন বা চিহ্ন হিসেবে পরিচিত। যেমন পবিত্র কাবা, দাড়ি, মসজিদ ইত্যাদি। [ভাষা-সম্পাদক]

হয়েছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতি যদি পরিপূর্ণভাবে এ দ্বীন গ্রহণ করে, সন্তুষ্টচিত্তে সব বিচার-ফায়সালায় এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, তবে তারা দ্বীনের মূল গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবে এবং এই মহান দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি এর সামান্য অংশের আনুগত্যও ত্যাগ করে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ঔদ্ধত্যের যেকোনো কারণই থাকুক না কেন, তারা দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টিকারী হিসেবে কলঙ্কিত হবে। তারা তো আল্লাহর উলুহিয়াতে (ইবাদত) শরিকানা স্থাপনের চেষ্টা করেছে। তাঁর রাজত্ব ও দাসদের মাঝে নিজেদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। এ সবদিক বিবেচনায় তারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে।

ভ্রান্তির অপনোদন

চলুন, এ আয়াতকে মূলনীতি ধরে কিছু আলোচনা করি। এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে, যে বা যারাই সন্তুষ্ট চিত্ত ও আত্মসমর্পিত হয়ে আল্লাহর শরিয়াতের কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে না, সে মুমিন নয়। এ ক্ষেত্রে এরচেয়ে শক্তিশালী বা সমপর্যায়ের কোনো দলিল নেই। বরং প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে তো এরচেয়ে কম শক্তিশালী ও সরল দলিলও নেই, যা এই আয়াতকে এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করতে পারে। ইমাম ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ রাখে, এমন একটি বিধানসংবলিত আয়াত বা এমন কোনো নসও অবতীর্ণ হয়নি, যা প্রকাশ্য অর্থ থেকে একে বের করে দেবে। এমনকি ইমানের কিছু অধ্যায়ের সাথে অর্থকে নির্দিষ্ট করারও কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।'[১৯০]

তবে ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) কিছু আলিম থেকে '(لَا يُؤْمِنُونَ) তারা ইমানদার হবে না'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, তারা ইমানের পূর্ণতা পাবে না (لا يستكملون الإيمان)।[১৯১] কিন্তু এই ব্যাখ্যা একাধিক কারণে অগ্রহণযোগ্য।

১. ভাষাতত্ত্ব : এটা আভিধানিকভাবেও প্রত্যাখ্যাত। কারণ, মাসদার (ক্রিয়ামূল) ছাড়া কোনো নাত (বিশেষণ) সাব্যস্ত হবে না। যেমনটা কাযি আবু যায়িদ আদ-দাবুসি (রাহিমাহুল্লাহ) 'তাকয়িম' গ্রন্থে বলেছেন। যদি আয়াতটি এইভাবে থাকত, و لا

[১৯০] আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল : ৪/৭১

[১৯১] ফাতহুল বারি : ৫/৩৬

[illegible] (ثابتا) [illegible] লা [illegible] তবেই নাত (বিশেষণ) সাব্যস্ত করা বৈধ হতো এবং তার পাশে [illegible] (পরিপূর্ণ) শব্দটি উহ্য ধরা ঠিক হতো; অথচ এখানে মাসদারই (ক্রিয়ামূল) নেই। তাই দাবুসির ভাষ্য অনুযায়ী এখানে বিশেষণ সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই প্রকাশ্য অর্থকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে। আসলে এখানে কোনো গোপন শব্দ উহ্য রাখারও প্রয়োজন নেই। কোনো প্রাধান্যদাতা নিদর্শন ছাড়া প্রকাশ্য অর্থকে পরিহার করে তাওয়িলের (ব্যাখ্যা) দিকে ঠেলে দেয়া অবৈধ।[১১২]

২. ফিকহশাস্ত্র : হানাফিদের কাছে কোনো উহ্য কর্ম (মাফউল) তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন কোনো বক্তব্যকে ঠিক রাখার জরুরি চাহিদা দেখা দেয়। আর কোনো বাক্যকে ব্যাপক করে দেয়াটা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বিষয়। তাই এখানেও উহ্য মাফউল (কর্ম) ধরা যাবে না। যেহেতু শব্দ বা বাক্যের ব্যাপকতার অবকাশ শেষ হয়ে গেছে, তাই সেই শব্দকে নির্দিষ্ট করার প্রশ্নও বাতিল হয়ে গেছে। কারণ, যে শব্দের ব্যাপকতার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সেই শব্দের নির্দিষ্টকরণের অবকাশও আর নেই। অতএব, কেউ যদি বলে, 'আমি খাবার খেলে আমার স্ত্রী তালাক', আর সে এর মাধ্যমে সব খাবার নয়, বরং বিশেষ কোনো খাবারের উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে হানাফিদের কাছে তাকে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যবাদী মনে করা হলেও ফায়সালার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যবাদী ধরা হবে না। মুতাকাল্লিমদের[১১৩] মত এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাক', আর সে এ দ্বারা তিন তালাকের নিয়াত করে, তবে হানাফিদের কাছে তার এই নিয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। শুধু এক তালাক রিজয়ি হবে।[১১৪] কিন্তু শাফিয়িদের কাছে তিন তালাকই হয়ে যাবে।

---

[১১২] অর্থাৎ, শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ী শরয়ি দলিল ছাড়া কোনো শব্দের প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করা জায়িয নেই। এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করে ব্যাখ্যাও বৈধ নয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[১১৩] ইলমুল কালাম ও মানতিকশাস্ত্রবিদদের মুতাকাল্লিম বলা হয়। অর্থাৎ, যারা দ্বীনের ব্যাপারে আকল তথা বিবেকের ওপর নির্ভর করে থাকেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

المتكلمون: مصطلح عرفي لكل من تكلم في الدين بغير طريق المرسلين

'মুতাকাল্লিমুন (কালামবিদ) হলো একটি উরফি (প্রচলনগত) পরিভাষা। এটি ওইসব লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যারা দ্বীনের ব্যাপারে নবি-রাসুলদের পন্থা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে কথা বলেন।' (শারহুল হামাওয়িয়্যাহ লি আবদির রাহিম আস-সুলামি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫)। [নিরীক্ষক]

[১১৪] যে তালাক দেয়ার পরও স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের ভেতরেই ফিরিয়ে নিতে পারে, তাকে তালাক রিজয়ি বলা হয়। এর জন্য নতুনভাবে বিয়ের প্রয়োজন হয় না। আর সেটা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয়বার তালাকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কেউ যদি স্ত্রীকে প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফিরা এই আয়াতের মাঝে উহ্য কোনো মাফউল (কর্ম) রাখা বৈধ মনে করেন না। কামাল ইবনু হুমামের 'ফাতহুল কাদির'-এ উল্লেখ আছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে, আমি গোসল করব না, অথবা বলল, আমি বিয়ে করব না—আর এর মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে হওয়া সহবাস থেকে গোসল করবে না উদ্দেশ্য নেয়—তাহলে তাকে একেবারেই সত্যায়ন করা হবে না। আমি মনে করি, কোনো আয়াত বা হাদিসকে নির্দিষ্ট করার জন্য ধারণানির্ভর কোনো মতামত যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ নয়। এ জন্যই শাফিয়ি মাযহাবের ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন,

'আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এটাই প্রমাণ করে যে, কিয়াসের[১১৫] মাধ্যমে নসকে নির্দিষ্ট (তাখসিস) করা বৈধ নয়। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর সব কথা ও বিচারব্যবস্থার আনুগত্য করা সার্বিকভাবে অপরিহার্য। আর আয়াতের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ নয়। আর এই আয়াতে যে পরিমাণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অন্য কোনো ইবাদত ও বিধিবিধানে এত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এ কারণেই কুরআনের বক্তব্য ও ব্যাপকতাকে কিয়াসের (রায়) ওপর প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব।'[১১৬]

৩. উক্ত ব্যাখ্যাটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের সাথেও অসংগতিপূর্ণ। এখানে আয়াতের অর্থ 'পরিপূর্ণ ইমান' ধরলে তো মূল আয়াতই চাপা পড়ে যায়। এটা আয়াতকে একেবারেই অসংগত করে তোলে। এর আগে আরও অনেক আয়াত এই আয়াতের অর্থকে আরও মজবুত করে যে, আল্লাহর শরিয়াহর সামনে সব বিচার-ফায়সালাকে

তালাক দেয়, তাহলে প্রতিবার তালাক দেয়ার পর ইদ্দতের ভেতরেই আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। তখন তাকে নিতে হলে পুনরায় নতুনভাবে বিয়ে করতে হয়। ইদ্দতের সময়সীমা হলো, ঋতুবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তিন মাসিককাল। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (যাদের ঋতুস্রাব হয়নি) এবং পরিণত বয়সের মহিলাদের (যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে) ক্ষেত্রে তিন মাস। আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হলো বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। [নিরীক্ষক]

[১১৫] যে বিষয়ে কোনো নস (আয়াত বা হাদিস) নেই, তাকে নস দ্বারা সাব্যস্ত অন্য একটি বিষয়ের দিকে ফেরানোকে কিয়াস বলা হয়—উভয়ের ইল্লত (কারণ) একই হওয়ার কারণে। ফলে বিধানও একই হয়। যেমন, গাঁজাকে মদের সাথে তুলনা দেয়া। উভয়টির ইল্লত একই। আর তা হলো নেশা। ফলে উভয়টির হুকুমও একই হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হারাম। তবে কিয়াস শরিয়াহর স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল নয়। এটা যন্নি (ধারণানির্ভর) বিষয়। তাই এর মাধ্যমে কোনো বিধানও সাব্যস্ত হয় না। নসের মাধ্যমে সাব্যস্তকৃত কোনো বিধানকে সুস্পষ্ট করে মাত্র। তেমনিভাবে কিয়াসের মাধ্যমে কোনো নসের ব্যাপক (আম) বিধানকে নির্দিষ্টও (খাস) করা যায় না। [নিরীক্ষক]

[১১৬] তাফসির মাফাতিহুল গায়িব : ৫/২৬১

ন্যস্ত করা এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশের সামনে সব মীমাংসা সমর্পণ করাই ইমান ও ইসলাম। এ ছাড়া ইমান ও ইসলামের মর্মই বা আর কী থাকে! এমন একটি আয়াত দিয়ে এর পরবর্তী ধারা শুরু করব, যা ইসলামপালনের শর্তসহ ইমান আনার সীমানাও নির্ধারণ করে দেবে। এই আয়াত দিয়ে শুরু করব,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'হে ইমানদারেরা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের কর্তৃত্বশীলদের। এরপর তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে বিভেদ হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যদি তোমরা আল্লাহর ও আখিরাতের প্রতি ইমান এনে থাক। এটিই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে শ্রেয়।'[১৯৭]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'বোঝা গেল, যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদে কিতাব-সুন্নাহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে না এবং এই দুটো বিষয়ের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে না, সে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না।'[১৯৮]

আপনারা কি ইবনু কাসিরের কথা খেয়াল করেছেন? তিনিও শরিয়াহর কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত না-করাকে ইমান থেকে বের হয়ে যাওয়া বলে গণ্য করেছেন—চাই সে যতই ইমান আনা এবং ইসলামপালনের দাবি করুক না কেন। পরের আয়াতটি বিষয়টিকে আরও মজবুত ও সন্দেহমুক্ত করে দিচ্ছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তারা তোমার প্রতি এবং

[১৯৭] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৫৯

[১৯৮] তাফসির ইবনু কাসির : ৫/১৯৩

তার প্রতি ইমান এনেছে। কিন্তু তারা নিজে
তোমার আগে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ইমান এনেছে। অথচ তাগূতকে অস্বীকার করতে
ফায়সালা তাগূতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাগূতকে অস্বীকার করতে
তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে
বিভ্রান্ত করতে। আর যখন তাদের বলা হয়, "তোমরা আসো, আল্লাহ যা
নাযিল করেছেন তার দিকে এবং তাঁর রাসুলের দিকে", তখন মুনাফিকদের
দেখবে তারা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে যাচ্ছে।'[১৯৯]

ইমানের বিষয়ে ধারণা কোনোই কাজে আসবে না। আর এ কারণেই তাগূত[২০০] অর্থাৎ আল্লাহর শরিয়াহ ছাড়া অন্য কোনো বিধানের কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা কোনোভাবেই ইমান নয়, বরং মারাত্মক পর্যায়ের ভ্রষ্টতা। শরিয়াহর কাছে বিচার-ফায়সালা

---

[১৯৯] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬০

[২০০] তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরয। তাগূতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কারও ইমান সাব্যস্ত হয় না। 'ইমান বিল্লাহ'র জন্য 'কুফর বিত-তাগূত' আবশ্যক। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।' (সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৩৬)।

তাগূত (طاغوت) শব্দটি এসেছে তুগইয়ান (طغيان) থেকে, যার আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি। তাগূত একটি শরয়ি পরিভাষা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তাগূত হচ্ছে ওইসব মাবুদ (উপাস্য), মাতবু (যাকে অনুসরণ করা হয়) বা মুতা (যার আনুগত্য করা হয়), যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সে-ই তাগূত, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর দেখানো পথের বিপরীতে যার আনুগত্য করা হয়, কিংবা যার আনুগত্য এমন বিষয়ে করা হয়, যা আল্লাহর আনুগত্য বলে তারা জানে না। এরাই হলো পৃথিবীর তাগূত। এদের ব্যাপারটা এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাগূতের ইবাদতে লিপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালা বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে দ্বারস্থ হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ বাদ দিয়ে তাগূতের আনুগত্য ও অনুসরণে লিপ্ত।' (ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন : ১/৫৩)। (দেখুন : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব, রিসালাতুন ফি মানাত-তাগূত; শাইখ আবুল হাসান আলি নাদভি, দ্বীনে হক আওর উলামায়ে রাব্বানি শিরক ও বিদআত কে খিলাফ কিউ (দরসে তাওহীদ : তাওহীদের চার প্রান্তপক্ষ)) [ভাষা-সম্পাদক]

ন্যস্ত না-করা এবং এ থেকে বাধাপ্রদান করাকে আল্লাহ নিফাকের আলামত সাব্যস্ত করেছেন। এরপর আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, শুধু বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য নয়, বরং অনুসরণ ও আনুগত্যের জন্যই তিনি রাসুলদের পাঠিয়েছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

'আমি যত রাসুল পাঠিয়েছি, সবাইকে কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় অনুসরণের জন্যই পাঠিয়েছি।'[২০১]

পরিশেষে আল্লাহ এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[২০২]

আয়াতটি যথাযথ স্থানেই এসেছে। আয়াতের ভাষ্যে এতটাই স্বচ্ছতা, ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি বিদ্যমান, যা মানুষের হৃদয়ে এ বিষয়টি গেঁথে দিতে পারে এবং সব ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে।

মানবজীবনে আল্লাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা

মানবজাতি যেসব দুরবস্থার শিকার হয়, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেসব দিকে প্রবাহিত হয়, জলে-স্থলে নিজেদের কৃতকর্মের ফলে যে ফাসাদের সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র যে দুঃখ-দুর্দশা মানুষের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে, এ সবকিছুর কারণ একটিই—মানুষের সৌভাগ্যের জন্য যে মৌলিক নীতিমালা দেয়া হয়েছিল, তা থেকে বের হয়ে যাওয়া। কিতাবুল্লাহর (কুরআন) কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করার মৌলনীতি ভুলে যাওয়া। সব বিষয়ের চাবিকাঠি এর মূল ও মালিক আল্লাহর কাছে হস্তান্তর না-করা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

---

[২০১] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৪

[২০২] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

'তাঁর কাছেই আসমান-জমিনের যাবতীয় বিষয়াবলির চাবিকাঠি।'[২০৩]

মানবজাতি যে দুঃখকষ্টের মোকাবেলা করছে, যেসব রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এ সবকিছুর একমাত্র সমাধান মহান আল্লাহর এই কিতাবের মাঝেই রয়েছে। কিতাবুল্লাহর কাছে সমস্ত বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়, বরং এরই নাম ইমান। আল্লাহর শরিয়াতের কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা ছাড়া ইমান ও ইসলামের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর অনুপস্থিতি মানে ইসলামেরই অনুপস্থিতি।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ-ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।'[২০৪]

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

'তারা বলে—আমরা আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ইমান এনেছি, আনুগত্য করেছি।' তারপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে তারা ইমানদার নয়।'[২০৫]

এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বহু আয়াত রয়েছে।

[২০৩] সূরা আল-শূরা, ৪২ : ১২

[২০৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৬

[২০৫] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শরিয়াহ-প্রত্যাখ্যান : বড় কুফর

দাসত্ব কেবল স্রষ্টার

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে।'[২০৬]

ইতিপূর্বে আমরা মানবজীবনে আল্লাহর শরিয়াহর কাছে সব বিচার-ফায়সালা সমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছি। তার অপূর্ব সৌরভ থেকে কিছু সুবাস গ্রহণ করেছি। এবার আমরা এই আয়াতের নির্মলতায় পরিশ্রান্ত হবো। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাযমের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছি যে, এই আয়াতটি তার অর্থের ব্যাপকতার ওপর বহাল রয়েছে। আয়াতটি কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও রাখে না এবং এমন কোনো বিপরীতমুখী আয়াত কিংবা হাদিসও নেই, যা আয়াতটিকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করে দেবে। অথবা এমন কোনো শক্তিশালী প্রমাণও নেই, যা ইমানের কিছু অধ্যায়ের সাথে আয়াতটিকে নির্দিষ্ট করতে পারে। কিছু আলিম আয়াতের যে অর্থ করেছেন, 'তারা ইমানের পূর্ণতা পাবে না'—এর অগ্রহণযোগ্যতাও প্রমাণ করেছি।

এই আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যের বিপরীতে অন্য কারও কথা চলবে না। উসুলের (উসুলুল ফিকহ) যত কিতাবাদি রয়েছে, প্রত্যেকটির প্রথম পাতা মহান ইমাম ও উসুলবিদদের এই কথার ওপর ইজমা উল্লেখের মাধ্যমে শুরু করা হয়—

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَه

'পুরো মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত, সবকিছুর ফায়সালাদানকারী একমাত্র আল্লাহ।'

---

[২০৬] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

এ কথাটিই কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন অকাট্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।'[২০৭]

এ আয়াতটি এমন একটি শব্দে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তা মহাপরাক্রমশালী একক সত্তার হাতে সব বিচারব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। সুরা ইউসুফে দুবার এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'সমস্ত মুসলিম একমত পোষণ করেছে যে, কারও সামনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ স্পষ্ট ও প্রকাশিত হলে তার জন্য সেই সুন্নাহ ছেড়ে অন্য কারও মতামত গ্রহণ করা বৈধ নয়।'[২০৮]

চেঙ্গিস খানের আইন দিয়ে কুরআনের আইনকে পরিবর্তন করার অপচেষ্টাই ছিল মুসলিম উম্মাহর শাসনব্যবস্থা থেকে কুরআন-সুন্নাহ অপসারণের প্রথম অপতৎপরতা। এর নাম ছিল আল-ইয়াসা বা আল-ইয়াসাক। সেই সময়ে তাফসির, ইতিহাস ও হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) বেঁচে ছিলেন। তিনি নিজের বক্তব্য লিখিত আকারে সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেন,

> 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হওয়া অকাট্য শরিয়াহকে যে পরিত্যাগ করবে, অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিচারব্যবস্থার কাছে নিজের বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করবে, নিশ্চিত সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে ওই ব্যক্তি কেন কাফির হবে না, যে আল-ইয়াসাকের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করে, কুরআনি ব্যবস্থার ওপরে একে প্রাধান্য দেয়? মুসলিমদের ঐকমত্যে অবশ্যই সে কাফির।'[২০৯]

আদি ইবনু হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে আসলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পড়ছিলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

'তারা (ইহুদি-খ্রিষ্টান) তাদের যাজক ও পুরোহিতদের এবং মারইয়ামপুত্র

---

[২০৭] সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪০, ৬৭

[২০৮] ইমাম ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন : ২/৩২৫

[২০৯] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ১৩/১৩১

মাসিহকেও আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।'[২১০]

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রিদের কীভাবে ইবাদত করত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদি ইবনু হাতিমের কাছে তার বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু আদি ইবনু হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা তো তাদের যাজক ও পুরোহিতদের ইবাদত করেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই। তবে তাদের যাজক ও পুরোহিতরা তাদের জন্য হারাম বিষয়গুলো হালাল এবং হালাল বিষয়গুলো হারাম করে দিয়েছিল। আর এতে তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করত। এটাই তাদের ধর্মগুরুদের ইবাদত।'[২১১]

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, সন্তুষ্টচিত্তে বা আনুগত্যপূর্বক মানবরচিত মতবাদের কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করা মানেই নিজের ঘাড় থেকে ইসলামের শেকল ছুড়ে ফেলা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ছেড়ে অন্যের কথা ও নির্দেশকে বিচারের মানদণ্ড মেনে সন্তুষ্ট থাকবে বা কুরআন-সুন্নাহর ওপর মানুষের মতবাদকে অগ্রগণ্য মনে করবে, ইসলামে তার কোনো অংশই নেই। এটা স্বয়ং কুফর। আর এতে কোনো অস্বচ্ছতা, সংশয় ও অস্পষ্টতাও নেই। আল্লাহই বিধানদাতা আর তাঁর কিতাব তাঁর বিধানের তত্ত্বাবধায়ক। কুরআন-সুন্নাহর ওপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার কোনো মানুষের নেই। মানুষের দায়িত্ব তো কেবল এর ওপর আমল করা, বাস্তবায়ন করা।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

'মানুষ ছিল এক উম্মাহ। এরপর আল্লাহ সুসংবাদবাহক ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে নবিদের পাঠালেন, আর সত্যসহ তাঁদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন—যেন মানুষের মাঝে ফায়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।'[২১২]

মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহও নিজ কিতাবের মাধ্যমে ফায়সালা করেন। এমনটিই উদ্ধৃত হয়েছে তাফসির জালালাইনে। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হবার প্রেক্ষাপট আমাদের মতকেই সমর্থন করে। আমরা বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরিয়াত ও

---

[২১০] সুরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৩১

[২১১] তাফসিরু ইবনি কাসির, সুরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৩১; সুনানুত তিরমিযি : ৩০৯৫; হাদিসটি হাসান। [নিরীক্ষক]

[২১২] সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৩

বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ফায়সালা করবে না, সে ইমানদার হতে পারে না। প্রকাশ্যে 'ল্য ইবাদত-বন্দেগি করলেও যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, সে মুসলিমই নয়।

একবার যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক আনসারি ব্যক্তির সাথে হাররা প্রান্তরের কোনো কূপ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালাপূর্বক বললেন—হে যুবাইর, তোমার জমি সিঞ্চন করে নাও। তারপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। তখন সেই আনসারি বলে উঠল—সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এ কথা শুনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'হে যুবাইর, তুমি নিজের জমি সিঞ্চন করো। এরপর পানি আটকিয়ে রাখো, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে।' যেহেতু ওই আনসারি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিরক্ত করছিল, তাঁর (নবি) মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের পূর্ণ হক বুঝে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। অথচ ইতিপূর্বে উভয়কে এমন একটি বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, যেখানে দুজনেরই সহজতা ও কল্যাণ ছিল।

যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—আমার মনে হয় এ সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে।'[২১৩], [২১৪]

ব্যক্তিটি ছিল আনসারি। তার মানে অবশ্যই সে বাহ্যত ইবাদত-বন্দেগি পালন করত। এত কিছুর পরও এ আয়াত তার ইমানকে বাতিল ঘোষণা করেছে।[২১৫]

---

[২১৩] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

[২১৪] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২৩৬১

[২১৫] একজন আনসারির ইমানকে নাকচ করাটা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। তবে আয়াতটি তাঁর ব্যাপারে নাযিল হওয়া সম্পর্কে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্ভাবনামূলক শব্দ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—আমার মনে হয় এ সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়তা দিয়ে বলেননি। অপরদিকে ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুইয়াহ তাঁর তাফসিরগ্রন্থে ইমাম শাবি থেকে সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন যে, এক ইহুদি ও মুনাফিকের মাঝে বিবাদের প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। বর্ণনাটি ইবনু হাজার আসকালানি 'ফাতহুল বারি'তে উল্লেখ করে একে সহিহ বলেছেন। (ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৭; মাকতাবা শামিলা)। পাশাপাশি ইমাম ইবনু আবি হাতিমও তাঁর তাফসিরগ্রন্থে

আল্লাহ ও রাসুলের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ করা গুরত্বপূর্ণ মূলনীতি। এবার আমি এই মূলনীতির সমর্থনে মুফাসসির কিরামের (তাফসিরবিদ) বেশকিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। কাযি আবু ইয়ালা আল-হাম্বলি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করা কুফরির নামান্তর। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট না-থাকা কুফরি। এটা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত।

প্রথম দলিল :

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

> "তারা তাগূতের কাছে নিজেদের বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করতে চায়, অথচ তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[২১৬]

এখানে তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্তকরণকে তাগূতের প্রতি ইমান আনা ধরা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে তাগূতের প্রতি ইমান আনার মানেই আল্লাহর প্রতি ইমান

উক্ত ঘটনাটি নিজ সনদে মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম, বর্ণনা নং : ৫৫৫৫)। ঘটনার বিষয়বস্তু হলো, বিবাদের সূত্রে ইহুদি লোকটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার দায়ের করতে চেয়েছিল। সে জানত যে, তিনি ঘুষ নিয়ে ফায়সালা দেন না। অপরদিকে মুনাফিক লোকটি যেতে চেয়েছিল ইহুদি বিচারকের কাছে। সে জানত, ওরা ঘুষ খেয়ে ফায়সালা দেয়। আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হওয়াটাই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ, এর আগে আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ইমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।' (সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬০)

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে 'নিজেকে মুমিন দাবি করেও তাগূতের কাছে বিচার দায়ের করতে চায়' বলে উক্ত মুনাফিককেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নয়তো যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাদী আনসারি লোকটি তো কোনো তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যায়নি। তবে এও সম্ভব যে, আয়াত অবতীর্ণকালে উভয় ঘটনাই সংঘটিত হয়েছিল। [নিরীক্ষক]

[২১৬] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬০

ভাবছে ফেলা, আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা। ঠিক যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা মানেই তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বিতীয় দলিল :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"[২১৭]

যে ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচারের প্রতি সন্তুষ্ট হয় না, এটা সেই ব্যক্তির কুফরির ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল।

তৃতীয় দলিল :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা নেমে আসবে অথবা তারা কঠিন কোনো শাস্তিতে পাকড়াও হবে।"[২১৮]

এই আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করা মারাত্মক অপরাধ। এই আয়াত প্রমাণ বহন করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনামা থেকে সামান্য কিছুও প্রত্যাখ্যান করবে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আদেশের কোনো অংশও ত্যাগ করবে, নিশ্চিত সে মুসলিম উম্মাহ থেকে ছিটকে পড়বে, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে—চাই সে সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ত্যাগ করুক বা ঔদ্ধত্য দেখিয়েই পরিত্যাগ করুক। এ জন্যই সাহাবা কিরাম যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) সাব্যস্ত করেছিলেন। হত্যাসহ তাদের সন্তানদের দাস বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ আয়াতই সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিশ্চিত করে।'[২১৯]

---

[২১৭] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

[২১৮] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৬৩

[২১৯] তাফসির কাসিমি : ৫/৫৫৩১; তাফসির মাফাতিহুল গাইব : ৩/৩৫২

কাসিমি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'কিছু কিছু মুফাসসির এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি তুষ্ট থাকা এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। এই আয়াত এও বলে, ইসলামি শরিয়াহ ত্যাগ করে অন্য কোনো ব্যবস্থার কাছে নিজেদের বিচার ন্যস্ত করা বৈধ নয়।'[২২০]

ইমাম হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধানে সন্তুষ্ট নয়, সে কাফির। আর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুনাফিকের সাথে যে আচরণ করেছেন, শেষে হত্যাও করেছেন[২২১]—এ ঘটনাই বলে দেয়, এমন ব্যক্তির রক্ত বৈধ ও মূল্যহীন। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হলে কোনো কিসাস (প্রতিশোধগ্রহণের বিধান) বা দিয়াত (রক্তমূল্য) আসবে না।'[২২২]

শর্তহীন আত্মসমর্পণ

আলোচনায় এখানে আরেকটি মাসআলা আসে। দুজন ব্যক্তি কোনো বিবাদ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলো। তো, তাদের একজন মুসলিমদের বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়। আরেকজন এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মুলহিদ বিচারকের কাছে ফায়সালা নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সে কুফরি করল। কারণ, এটাই কাফিরদের বিচারব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ। সে ব্যক্তি এমন আইন ও শাসননীতিতে সন্তুষ্ট, যেগুলো আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তারা বানিয়েছে। বরং সেগুলো কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যের সাথেই সাংঘর্ষিক।

---

[২২০] জামালুদ্দিন আল-কাসিমি, মাহাসিনুত তাওয়িল, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৫; শামিলা

[২২১] উমার ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক মুনাফিককে হত্যার ঘটনা কোনো একক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি। ইমাম ইবনু আবি হাতিম তাঁর তাফসিরগ্রন্থে নিজ সনদে ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন। তবে সনদটা মুরসাল এবং এতে ইবনু লাহিয়া নামক এক প্রসিদ্ধ দয়িফ বর্ণনাকারীও আছে। (তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম, বর্ণনা নং : ৫৫৬০)। তবে উক্ত ঘটনাটা অন্য একটা দয়িফ সনদে অনেকটা ব্যতিক্রমীভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার বলেছেন—ইমাম কালবি তাঁর তাফসিরগ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার নিজেই এর সনদকে দয়িফ বলেছেন। (ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৮)। উভয় বর্ণনার বিবরণ ও ভাষ্য যদিও এক নয়, তবে উভয়টাতেই উমার কর্তৃক মুনাফিককে হত্যার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তাই এর দুর্বলতা কিছুটা হালকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। [নিরীক্ষক]

[২২২] তাফসির কাসিমি : ৫/৫৫৩১

আমি বলব, যে ব্যক্তি মানবরচিত মতবাদ ও জীবনব্যবস্থায় তুষ্ট থাকবে, তোরপরেও না হয়ে এই অসার ব্যবস্থার কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে বা সন্তুষ্টচিত্তে ওই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রচলন দেয়ার চেষ্টা করবে অথবা ওই অসার ব্যবস্থা স্বীকার করে নেবে কিংবা তার বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে, তার ওপরই আয়াতের বিধান প্রয়োগ হবে এবং এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডি থেকে সে বের হয়ে যাবে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, ইমাম বুখারি (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত এক আনসারি ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তিনি তো দৃঢ়ভাবে ইসলামের ইবাদত-বন্দেগি পালন করতেন, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিও করতেন। এতকিছুর পরও তার ইমানহীনতার ঘোষণা এসেছে। সর্বোপরি এ ব্যাপারে আল্লাহর শপথ কত কঠোর, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শরিয়াতের কাছে বিচার-ফায়সালা ন্যস্ত করবে না, সে মুমিনই নয়।[২২৩]

উসতায সাইয়িদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন,

> 'আল্লাহ নিজ মহিমান্বিত সত্তার শপথ করে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি ইমানদার হবে না, যতক্ষণ তার যাবতীয় বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা না-দেবেন। তারপর তাঁর নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের আনুগত্য করবে। এটি গ্রহণ করতে গিয়ে মনে কোনো ধরনের সংকোচ ও ইতস্ততবোধ থাকবে না।
>
> فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
>
> "না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"[২২৪]

স্বয়ং আল্লাহ বিষয়টিকে সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত করছেন এবং নিজ সত্তার শপথ করে ঘোষণা দিচ্ছেন। এরপরও ইমানের শর্ত নির্ধারণ এবং ইসলামের পরিচয়প্রদানে কোনো ব্যক্তির কথার কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো অপব্যাখ্যাকারীর অপব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। হে আল্লাহ, সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত নয় এমন সব কলহ থেকে পানাহ চাই। আর তা

[২২৩] আয়াতটি নাযিলের মূল প্রেক্ষাপট ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ঘটনা নিয়ে ইতিপূর্বে ২১৪ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [নিরীক্ষক]

[২২৪] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

হলো যে, এ কথাটি (বিধান) কোনো যুগের সাথে সম্পৃক্ত এবং বিশেষ দলের ওপর ন্যস্ত। এমন কথা তো কেবল ওই লোকেরাই বলতে পারে, যারা ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না এবং কুরআনের ব্যাখ্যা স্বল্প-বিস্তর কিছুই বোঝে না। বরং এটিই ইসলামের সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়, যা আল্লাহর মজবুত শপথেই ফুটে উঠেছে, যা সব শর্ত থেকে মুক্ত ছিল। আর এখানে কোনো ধ্যান-ধারণারও অবকাশ নেই। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফায়সালাদানকারী মনোনীত করা এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বিচারব্যবস্থার স্বত্বাধিকারী মেনে নেয়ার অর্থই হলো তাঁর আনীত শরিয়াহ ও মানহাজকে সব ফায়সালার জন্য মনোনীত করা। তা না হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আল্লাহর শরিয়াহ ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহর কোনো স্থানই থাকবে না। প্রথম খলিফাহ আবু বাকরের যুগে এ বক্তব্যই মুরতাদদের অবিশ্বাস ও বিচ্যুতি আরও তীব্র করে তুলেছিল। যার কারণে তিনি তাঁদের সাথে লড়াই করেছেন, বরং এরচেয়ে আরও অনেক ছোটখাটো বিষয়েও লড়াই করেছেন। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য না-করার কারণে এবং মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার-ফায়সালাকে গ্রহণ না-করার কারণে যুদ্ধ করেছেন। অতএব, কোনো ব্যক্তির ইসলাম প্রমাণ করতে হলে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর শরিয়াহ ও নবির নির্দেশের কাছে সব বিচার-ফায়সালা ন্যস্তকরণ যথেষ্ট হলেও কারও ইমান প্রমাণ করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হবে না, বরং এর জন্য প্রশান্তির সাথে অন্তরের তুষ্টি, হৃদয়ের স্বীকৃতি এবং অন্তরাত্মার আত্মসমর্পণ থাকতে হবে। এটিই ইসলাম। এটিই ইমান। অতএব, নিজের অন্তরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, আপনার মন ও প্রবৃত্তি ইসলাম ও ইমান থেকে কত দূরে!'[২২৫]

কুরআন-সুন্নাহ প্রকাশ্য অর্থে

আমরা মুফাসসির কিরামের বেশকিছু মতামত উল্লেখ করেছি। এর অনুসরণে মানবজাতির সব জঞ্জাল দূর করার একমাত্র সমাধানটি বের হয়ে আসবে। এরপর মানুষের আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না যে, ব্যাপক অর্থবোধক এই আয়াতে বিশেষ অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে ইমান তার ব্যাপকতার অর্থ হারিয়ে 'পূর্ণাঙ্গ ইমান' অর্থে ব্যবহৃত হবে। এসব কথা বলার আর কোনো সুযোগই নেই।[২২৬]

---

[২২৫] ফি যিলালিল কুরআন : ২/১৭০-১৭১

[২২৬] অর্থাৎ এই ব্যাপক আয়াতকে নির্দিষ্ট করে এমন কোনো দলিল নেই। তাই বলা যাবে না যে, এখানে ইমান মানে পূর্ণাঙ্গ ইমান উদ্দেশ্য। [ভাষা-সম্পাদক]

যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে এই আয়াতে বিশেষ অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, তবে তাকে যেন সনদসহ এমন কোনো দলিল উপস্থাপন করে, যা আয়াতকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করে আনবে। অর্থাৎ আয়াতের অর্থের ব্যাপকতা ছেড়ে বিশেষ অর্থগ্রহণের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ, আয়াতের যাহিরি (প্রকাশ্য) অর্থকে ব্যাখ্যা করতে হলে তারচেয়ে মজবুত কোনো দলিল থাকতে হবে। কোনো ধরনের কিয়াস আয়াতকে তার ব্যাপক অর্থ থেকে বের করতে পারে না। আমরা এ ব্যাপারে আগেও আলোচনা করেছি। ইমাম রাযির বক্তব্যও তুলে ধরেছি যে,

> 'আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এটিই প্রমাণ করে, কিয়াসের মাধ্যমে নসকে (আয়াত বা হাদিস) তাখসিস (সীমাবদ্ধ) করা বৈধ নয়। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দাবিই হচ্ছে, আল্লাহর কথা ও হুকুমের আনুগত্য করা সার্বিকভাবে অপরিহার্য।'[২২৭]

তিনি আরও বলেন,

> 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এই শপথ যে, লোকেরা ইমানের বৈশিষ্ট্যে শোভিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ইমানের বেশকিছু শর্ত পূর্ণ করবে—এসব শর্তের প্রথম হলো, যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক বিবাদ নিরসনের ভার আপনার ওপর ন্যস্ত করবে।'[২২৮]

আমরা এতেই তৃপ্তিবোধ করছি, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের প্রতি অনুগত হয়েছি এবং তার শক্তিশালী অর্থের ব্যাপকতার প্রতি অনুরক্ত রয়েছি। এখানে তো অর্থের ব্যাপকতা ছেড়ে কিয়াস দিয়ে বিশেষ অর্থগ্রহণ সম্ভব নয়। উক্ত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এবং আয়াতের ধারাবর্ণনা আমাদের সমর্থনে রয়েছে। যা ওইসব আয়াতে কেবল হাকিমিয়াহর বুঝকে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার জন্য এসেছে। আমাদের সামনে মুফাসসির কিরামের আরও সুস্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে।

গভীর ষড়যন্ত্র

আমরা আমাদের চারপাশে চোখ বোলালেই একসময়ের ইসলামশাসিত শহর-জনপদগুলোতে আশ্চর্যজনক কিছু অধ্যায় দেখতে পাবো। সেই অঞ্চলগুলোর লোকেরা

[২২৭] তাফসির মাফাতিহুল গায়িব : ১০/১০২-১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, হিজরি : ১৪২১

[২২৮] তাফসির মাফাতিহুল গায়িব : ১০/১০১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, হিজরি : ১৪২১

পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভিন্ন দুই মেরুতে বসবাসকারী। একদলকে দেখতে পাবো, তারা তাগূতি বিচারব্যবস্থার কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করছে এবং আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়াহর কাছে বিচার চাওয়া একেবারেই ত্যাগ করেছে। কিন্তু তারা এই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ আঁচই করতে পারেনি যে, এই জঘন্য কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর দ্বীন ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় দলকে দেখতে পাবো, তারা তাগূতি মতবাদের কাছে সব বিচারের দায়িত্ব তুলে দেয়, আবার পাশাপাশি এই মহান দ্বীনের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ ছড়ায়; যদিও জন্ম ও ভূখণ্ড তাদেরকে 'মুসলিম' হিসেবেই সাক্ষ্য দেয়। অজ্ঞতা, গাফলতি, ইসলামি শাসনব্যবস্থা না-থাকা ও মুসলিমদের ইমাম অপসারিত হবার কারণে এই বিপদ মুসলিমদের ওপর চেপে বসেছে। এরপর ইহুদিদের ঘোর চক্রান্তে পতন ঘটে উসমানি সুলতান আবদুল হামিদের। এক ভয়াবহ পরিকল্পনার মাঝ দিয়ে এই ষড়যন্ত্র শেষ হয়। সেখানে ইহুদিদের অনেকগুলো গুপ্ত সংগঠন যুক্ত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন রকমের পতাকা, প্রতীক ও শিরোনাম ব্যবহার করে। যেমন ফ্রিম্যাসন, তুর্কি যুবপরিষদ এবং উন্নয়ন ও ঐক্যসংহতি পরিষদ ইত্যাদি। এরা নিজেদের জালে এই মহান দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখা অসংখ্য মানুষকে শিকার করে।

এমনকি তাদের এই টোপে আধ্যাত্মিকধারার সুফিদের অনুসারী ও দ্বীনি ব্যক্তিবর্গের সংশ্রবে থাকা লোকও আটকে যায়। শুধু তাই নয়, সে সময় আযহারের এক শীর্ষ আলিম লেবাননভিত্তিক ফ্রিম্যাসনের[২২৯] অনুষ্ঠান থেকে শঙ্খপ্রতীক ও ঝিনুকব্যাজ অর্জন করে। আরও বিস্ময়কর সংবাদ হলো, মিশরে সর্বপ্রথম এই ফ্রিম্যাসনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাও এমন ব্যক্তির হাতে যাকে কিনা বিরাট ইসলামি দায়ি মনে করা হতো! আর ফ্রিম্যাসনের দ্বিতীয় সভাও অনুষ্ঠিত হয় ওই ব্যক্তির এক ছাত্রের হাতে। অতএব, বিষয়টা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এতে কোনো তর্ক-বিতর্ক নেই যে, ফ্রিম্যাসন গুপ্তসংঘ ও জায়নবাদ[২৩০]

---

[২২৯] ফ্রিম্যাসনরি একটি গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘ। ফ্রিম্যাসনদের দাবি অনুসারে বর্তমানেও এই সংঘ তথা সমাজের মিলিয়ন মিলিয়ন সদস্য রয়েছে, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে বিরাজমান। তবে তাত্ত্বিকদের অনেকের মতেই প্রকৃত ফ্রিম্যাসনরির স্থায়িত্বকাল ছিল শলোমনের মন্দির নির্মাণের সময়কাল থেকে মধ্যযুগে ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৩০] পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠিত ইহুদিবাদি আন্দোলন। 'জায়ন' বা আরবি 'সহয়ুন' হচ্ছে ফিলিস্তিনের কুদস শহরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। জায়নবাদ আন্দোলন ইহুদিদের থেকে জন্ম হলেও ইহুদিরা দীর্ঘদিনব্যাপী অত্যন্ত কৌশল ও চতুরতার মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে খ্রিষ্টানদেরকেও এতে ভিড়িয়ে নেয়। ফলে খ্রিষ্টানরা আসল খ্রিষ্টান ও জায়নিস্ট খ্রিষ্টান এই দুই দলে পরিচিত হয়। একসময় এই খ্রিষ্টানদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়ই ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইহুদিবাদ ও জায়নবাদে পার্থক্য হলো, ইহুদিবাদ একটা ধর্ম, আর জায়নবাদ

একই কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা দুটো শাখা; বরং একই মায়ের জোড়োয়া সন্তান। এই ইহুদিবাদীদের হাতেই রয়েছে নীল নকশাকারীদের রহস্যময় সূত্র এবং বিভিন্ন কলকাঠি। এই নকশাগুলোর সাহায্যে তারা মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিতে চায়। ধ্বংস করে দিতে চায় পৃথিবীর সব দ্বীনকে।

এ তো গেল একপ্রকারের নীল নকশা ও ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে, গোটা সহজ-সরল মুসলিম সমাজে তাদের কলাকৌশল ও পরিকল্পনা চেপে বসে। তাদের এই নতুন ধর্ম—মানবরচিত অনুশাসন—পৃথিবীতে আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীনের স্থান দখল করে নিল। আর সেই নতুন ধর্মকে এমন এক কানুনে পরিণত করা হলো যে, আমাদের সন্তানেরাই এর পঠনপাঠন শুরু করে দেয়। গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্সটিটিউট। আর এসব বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্সটিটিউট বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা অনুষদগুলোর নেতৃত্ব দিতে লাগল। সেগুলোতে এই নতুন ধর্মব্যবস্থার সব আইন ও অধিকার চর্চা হতে থাকে। হাজার হাজার আগ্রহী মুসলিমসন্তান এতে ভর্তির সুযোগ নিয়ে শিখতে আরম্ভ করল। নতুন এই ধর্মের ওপর ডিগ্রি নিল। পরবর্তীকালে তারাই পরিণত হলো এই নতুন ধর্মের রক্ষক, প্রহরী, পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাবেত্তায়। তারাই গ্রহণ করল এর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব।

কী অদ্ভুত লক্ষ্য নিয়ে তারা ওইসব প্রতিষ্ঠানের ভার নিয়েছে। রাষ্ট্রের নেতৃত্ব হাতিয়ে নিয়েছে। যেসব শহর ও জনপদ এক সময় দারুল ইসলাম[২৩১] ছিল, এখন তারা সেসব অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং জনগোষ্ঠীর মূল নিয়ন্ত্রক ও চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এভাবে একসময় তারা মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের খেলাড়ি হয়ে উঠল এবং জনগণের রক্ত-মাংস ও ধন-সম্পদের রক্ষক-ভক্ষকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হলো। অবশেষে হারিয়ে গেল আল্লাহর দ্বীনের রৌশনী। কেবল বাকি থাকল দৃশ্যমান কিছু ইবাদত-বন্দেগি ও আচার-প্রথা। তাও দ্বীনের প্রতি গভীর অনুরাগী কিছু মানুষ এগুলো ধরে রেখেছেন।

একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। [নিরীক্ষক]

[২৩১] যে ভূমি বা অঞ্চলে শরিয়াতের বিধিবিধান ও আইন বলবৎ থাকে তাকে 'দারুল ইসলাম' বলে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'অধিকাংশ ফুকাহা কিরাম বলেন, "দারুল ইসলাম" ওই ভূখণ্ডকে বলে, যেখানে মুসলিমদের আগমন ঘটে এবং তাতে ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকে। আর যেখানে ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকবে না, সেটা "দারুল ইসলাম" হবে না; যদিও তা দারুল ইসলামের সাথে লাগোয়া অঞ্চল হোক। দেখো এই যে মক্কার অদূরেই অবস্থিত তায়িফ, মক্কা বিজয় সত্ত্বেও সেটা "দারুল ইসলাম" হয়ে যায়নি।' (আহকামু আহলিয যিম্মাহ : ১/৭২৮)। [তাদা-সম্পাদক]

জাহিলিয়াতের বিধান

আমরা বলতে পারি, যারা আল্লাহপ্রদত্ত শারিয়াতের প্রতি সব আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করবে না, অথবা আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থা পাশ কাটিয়ে অন্য মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকবে কিংবা আল্লাহর বিধানের সাথে মানুষের তৈরি ও প্রবর্তিত অন্যান্য মতবাদ, আচার-প্রথাকে সংযুক্ত করবে, এমনকি ভিন্ন অনুশাসন দিয়ে আল্লাহর বিধান অপসারণের সমর্থন দেবে, তারা এই দ্বীনের সীমা থেকে ছিটকে পড়বে। নিজের দাবি থেকে ইসলামের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলেছে বলে গণ্য হবে। সে কাফির অবস্থায় এই মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

উসতায সাইয়িদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'যারা প্রতিমাপূজারীদের ওপর শিরকের হুকুম লাগায় কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থীর ওপর শিরকের হুকুম লাগাতে পারে না, সংকোচ বোধ করে—কিন্তু ওখানে ঠিকই সংকোচবোধ করে না—তারা মূলত কুরআনও পড়েনি, এই মহান দ্বীনের স্বভাব-প্রকৃতিও বোঝেনি। তারা যেন গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে, ঠিক ওইভাবে যেই স্বভাব-প্রকৃতির ওপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। তারা যেন আল্লাহর এই আয়াত অনুধাবন করে এবং আঁকড়ে ধরে,
>
> وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
>
> "যদি তোমরা তাদের (মুশরিকদের) আনুগত্য করো, তাহলে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।"[২০২]'[২০৩]

চমৎকার হবে যদি আমরা উসতায আহমাদ শাকিরের[২০৪] বক্তব্যের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের

---

[২০২] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১২১

[২০৩] ফি যিলালিল কুরআন : ৩/১৫৪

[২০৪] আহমাদ ইবনু মাহমুদ শাকির [২৯ জানুয়ারি, ১৮৯২—১৪ জুন, ১৯৫৮] : প্রখ্যাত মিশরীয় মুহাদ্দিস। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। সেখানে চারমাস শিক্ষকতাও করেন তিনি। তারপর বিচারকের দায়িত্ব নেন। শরয়ি বিচারিক আদালতের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার আসন গ্রহণ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি, শাইখ তাহির আল-জাযায়িরিসহ আরও উলামা কিরামের কাছে হাদিসের ইলম গ্রহণ করেন তিনি। শাইখ আহমাদ শাকিরের বিখ্যাত রচনাকর্ম হচ্ছে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের 'আল-মুসনাদ'-এর তাহকিক। তিনি এ গ্রন্থের তাহকিক এক তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি সম্পন্ন করেন। এ ছাড়াও বহু

ছুড়ে টানি।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'[২০৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উসতায আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'এই নতুন ধর্মকে লুফে নেয়া কি কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ হবে? ছেলে-মেয়েকে এই নতুন ধর্মটি শিখতে, এর চিন্তাবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে এবং এর কার্যকর ও প্রায়োগিক দিক আয়ত্ত করতে পাঠানো কি কোনো বাবার জন্য বৈধ হবে, চাই সে জেনেশুনে পাঠাক বা না-জেনেই? কোনো মুসলিমের জন্য কি অনুমতি আছে এই নব্য রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচারক পদে বসার? না, এই অবস্থায় কোনো মুসলিমের জন্য বিচারবিভাগের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কোনোভাবেই সেটা শুদ্ধ হবার সুযোগই নেই। মানবরচিত এই নব্য মতবাদ ও বিচারকাঠামোর সবদিক সূর্যের মতো সুস্পষ্ট। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত কুফরি, এর মাঝে কোনো অস্পষ্টতা নেই। যে-ই হোক না কেন, এই ব্যবস্থার জন্য কাজ করা বা তার সামনে নত হওয়া কিংবা এর স্বীকৃতি দেবার ওজর কোনো মুসলিমেরই চলবে না। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির সতর্ক ও সজাগ থাকা উচিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাফসের হিসাবগ্রহণকারী।'[২০৬]

এতেও এর কাজ রয়েছে।। [ভাষা-সম্পাদক]

[২০৫] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫০

[২০৬] উমদাতুত তাফসির : ৪/৪৭

সপ্তম অধ্যায়

অপব্যাখ্যার কবলে বিধানপ্রণয়নসংক্রান্ত আয়াত

প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায়, যেসব আয়াত আল্লাহর আইন ছেড়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার ফায়সালাকারীদের দৃঢ়ভাবে কাফির বলে ঘোষণা দিচ্ছে, সেসব আয়াতে কুফরির উদ্দেশ্য নাকি কর্মগত কুফর, বিশ্বাসগত কুফর (যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়) নয়।[২৩৭] তবে কেউ কেউ সত্য প্রকাশ করে বলেন, যে ব্যক্তি তাগূতের কাছে সব বিচার-ফায়সালার দায়িত্ব ন্যস্ত করবে তার পূর্ণাঙ্গ ইমানই নস্যাৎ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ অদ্ভুত কথা বলেন যে, এই আয়াতে নাকি মুসলিমরা উদ্দিষ্টই নয়। এই কথাগুলোর খণ্ডনসহ সঠিক বাস্তবতা তুলে ধরা প্রয়োজন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু প্রাথমিক কিন্তু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যারা দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁরাও বিষয়গুলো উদাসীনতার সাথে এড়িয়ে চলেন অথবা এ ব্যাপারে অন্ধের মতো আচরণ করেন।

নিগূঢ় বাস্তবতা

▪ এক

বড় বড় সাহাবি যেমন, আবু বাকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কথার অলংকারকে কুরআনের বরাবর মনে করা সুস্পষ্ট কুফর, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে

---

[২৩৭] আমলগত বা কর্মগত কুফর মানেই ছোট কুফর, এটা ভুল ধারণা। কর্মগত কুফরও বড় কুফর হতে পারে। অন্যদিকে এই ধারণাও ভুল যে, বিশ্বাসগত কোনো ভুল থাকা মানেই বড় কুফর। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রায় অধিকাংশ বড় কুফরেই বিশ্বাসও জড়িত থাকে। (দেখুন : শাইখ আসিম আল-বারকাওয়ি, হাযিহি আকিদাতুনা; শাইখ ড. আবদুর রহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, 'আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ : আহওয়ালুহু ওয়া আহকামুহু', বাংলা সংস্করণ; শাইখ আলি বিন খুদাইর আল-খুদাইর, মুযাক্কিরাতুন ফি শারহি নাওয়াকিদিল ইসলাম, বাংলা সংস্করণ) [ভাষা-সম্পাদক]

মুসলিম উম্মাহর সবাই একমত। তাহলে কেউ যদি বলে নেপোলিয়ন[২৩৮], ক্যাম্পি... জসুরিয়াস ও জাস্টিনিয়ানের[২৩৯] বক্তব্য কুরআনের অর্থ কিংবা শব্দের আলংকারিক ভাষ্যের সমান, অথবা তাদের রচিত মতবাদ আল্লাহর শরিয়াহর সমপর্যায়ের, কেউ আরও এগিয়ে এসব প্রতিমাবাদী বিধিবিধানকে আল্লাহর দ্বীনের ওপরই প্রাধান্য দিয়ে দেয়, তাহলে কীভাবে সে কাফির হয় না? সাহাবি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

> ‘ধিক তোমাকে! তাঁরা (আবু বাকর ও উমার) তোমার কাছে বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, না কি আল্লাহর কিতাবে যা আছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবা ও উম্মাহর মাঝে যে সুন্নাহ চালু করে গেছেন সেগুলো?’[২৪০]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> ‘ওই লোকদের দেখে আমি বিস্মিত হই, যারা সনদ সম্পর্কে জানে, তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে, তবুও তারা সুফিয়ানের রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ বলেন,
>
> فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
>
> “যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা নেমে আসবে অথবা কঠিন কোনো শাস্তিতে পাকড়াও হবে।”[২৪১]
>
> তুমি কি বলতে পারবে ফিতনা কী জিনিস? শোনো, ফিতনা হলো শিরক। হতে পারে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের কিছু অংশ পরিত্যাগ করার

---

[২৩৮] নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বা নাপোলেওঁ বোনাপার্ত (ফরাসি : Napoléon Bonaparte) [১৫ আগস্ট, ১৭৬৯—৫ মে, ১৮২১] : সমরবিদ, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসাল (First Consul), ফ্রান্সের সম্রাট ও ইতালির রাজা। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপের আজাক্সিও শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯-৯৯) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। নেপোলিয়নকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক জেনারেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৩৯] ফ্ল্যাভিয়াস জাস্টিনিয়াস (Flavius Justinianus) [৪৮৩—১৪ নভেম্বর, ৫৬৫] : বাইজেন্টাইন সম্রাট। চাচা প্রথম জাস্টিনের সাথে যৌথভাবে মসনদে বসেন ৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে। চাচার মৃত্যুর পর তিনিই হন একমাত্র সম্রাট। জাস্টিনিয়ান কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুবরণ করেন। (তথ্যসূত্র : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা; অন্যান্য) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৪০] ইমাম তাবারানি, আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং : ২১; হাসান। [নিরীক্ষক]

[২৪১] সুরা আন-নুর, ২৪: ৬৩

কারণে তার অন্তরে বক্রতা ও ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে সে ধ্বংস হয়েছে।'[২৪২]

▪ দুই

যরুরিয়াতুদ-দ্বীনের[২৪৩] কোনো একটি বিষয় অস্বীকার করাও এমন কুফর, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন, যে ব্যক্তি বলবে আসরের সালাত তিন রাকাত, সে কাফির হয়ে যাবে। যে বলবে—ফরয সাওম রমাদানে রাখা কিংবা শাওয়ালে রাখা বরাবর ও জায়িয, এতে ফরয আদায় হয়ে যাবে—সেও মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ এবং কাফির। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে—চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কেটেও দেয়া যাবে অথবা জেলে বন্দি করে রেখেও দেয়া যাবে, এতে কোনো সমস্যা নেই—সেও কাফির। তাহলে ওই ব্যক্তি কীভাবে কাফির নয়, যে চোরের হাতকাটাকেই হিংস্রতা ও বর্বরনীতি বলে? মিশরীয় আইনসভার মুখপাত্র এমনটা বলেছিল।

▪ তিন

শরিয়াতের কোনো ছোট বা আংশিক বিষয়েও হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা সুস্পষ্ট কুফর। এটা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

বারকায়ি (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি সহিহ হাদিস বর্ণনা করেন যে, জারুদ বাহরাইন থেকে এসে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কুদামাহ ইবনু মাযউনকে দেখলাম নেশাদ্রব্য পান করছে। আমি চিন্তা করলাম এতে তো আল্লাহর একটি হক নষ্ট হলো। বিষয়টা আপনার কাছে উপস্থাপন করা আমার অপরিহার্য কর্তব্য মনে করছি।'

তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তোমার কথার স্বপক্ষে সাক্ষী কে?' তিনি বললেন—হাঁ, আবু হুরাইরাহ সাক্ষী আছেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু হুরাইরাহকে ডেকে পাঠালেন। তারপর বললেন, 'আবু হুরাইরাহ, তুমি কি সাক্ষ্য দিতে পারবে?' তিনি বললেন—আমি তাকে নেশা করতে দেখিনি, তবে মাতাল অবস্থায় বমি করতে দেখেছি। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—তবে তো তুমি স্পষ্ট সাক্ষ্যই দিলে।

---

[২৪২] আল-ইবানাহ : ১/২৬০

[২৪৩] যরুরিয়াতুদ-দ্বীন বলতে দ্বীনের সেসব জরুরি আকিদাহ ও বিধানের সমষ্টি বোঝায়, যা অকাট্যভাবে দ্বীনের অংশ হিসেবে প্রমাণিত এবং সবাই এগুলোকে দ্বীন বলেই জানে। যেমন, তাওহিদ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও রমাদানের সিয়াম ফরয হওয়া, সুদ ও ব্যভিচার হারাম হওয়া ইত্যাদি। [ভাষা-সম্পাদক]

কুদামাহ ইবনু মাযউন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন বাহরাইনে। চলে আসার নির্দেশ দিয়ে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে চিঠি পাঠালেন। যখন কুদামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এসে পৌঁছলেন, তখন জারুদও মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে জারুদ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আবেদন জানালেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জারুদকে বললেন, 'তুমি কি সাক্ষীদাতা নাকি বাদী?' জারুদ বললেন—আমি সাক্ষীদাতা মাত্র। তিনি বললেন—তাহলে তোমার সাক্ষ্যদানের কাজ শেষ। তখন জারুদ বলে উঠলেন—আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, একে শাস্তি দিন। তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন—আল্লাহর দোহাই লাগে তুমি তোমার জিহ্বার লাগাম টেনে ধরো, নয়তো তোমাকেই শায়েস্তা করা হবে। জারুদ বললেন, 'তাহলে তো এটা অন্যায় হবে। আপনার চাচাতো ভাই নেশা করবে আর আপনি আমাকে শায়েস্তা করবেন!' আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বসা থেকে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি যদি আমাদের সাক্ষ্যের ওপর তুষ্ট না হন, সংশয়ে থেকে থাকেন, তাহলে ওয়ালিদকন্যা ইবনু মাযউনের স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

তিনি হিন্দের কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাঁকে আল্লাহর শপথ দিয়ে সত্যতা জিজ্ঞেস করেন। হিন্দ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন—এখন আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করতে পারি। কুদামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন—হে উমার আল্লাহর কসম, তাদের দাবি অনুযায়ী যদি আমি নেশা করেও থাকি তবুও আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করতে পারবেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' কুদামাহ বললেন, 'কারণ আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা আগে যা খেয়েছে সেজন্য তাদের কোনো গোনাহ নেই, যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[১৪৪]"

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'কুদামাহ, তুমি অপব্যাখ্যা করছ। তুমি যদি সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভয় করতে তবে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে মত্ত হতে না।' তারপর

[১৪৪] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯৩

তিনি লোকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কুদামাহর বেত্রাঘাতের ব্যাপারে আপনারা কী বলেন?' তখন লোকজন বলল—আমরা বলি, সে যতদিন অসুস্থ আছে ততদিন তাকে বেত মারতে পারেন না। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বেত মারা থেকে বিরত রইলেন। এরপর একদিন তিনি শুরা পরিষদকে বললেন, 'কুদামাহর বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের কী অভিমত?' তাঁরাও মত দিলেন—তিনি যতদিন অসুস্থ আছেন, বেত মারা থেকে বিরত থাকুন।

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি নিজ কাঁধে তাকে বহন করতে করতে আল্লাহর সাথে দেখা করার চেয়ে বেত্রাঘাত খেয়ে আল্লাহর সাথে তার দেখা করাটা আমার কাছে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমি তাকে এখনই বেত মারব। তোমরা চাবুক নিয়ে এসো।'

তাঁর আযাদকৃত গোলাম আসলাম একটি পাতলা ও ছোট চাবুক নিয়ে আসলে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাবুকটা হাতে নিয়ে স্পর্শ করে দেখলেন। আসলামকে বললেন, তোমাকে তো স্বজনপ্রীতি পেয়ে বসেছে। তারপর এটি রেখে অন্য আরেকটি চাবুক নিয়ে আসার আদেশ করলেন। আসলাম অন্য আরেকটি চাবুক নিয়ে এল। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। চাবুক মারা হলো। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষেপিয়ে তুললেন, ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কথা কাটাকাটিতে কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিঃশ্চুপ করে দিলেন। কিন্তু তবুও কুদামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে লোকজন তাঁদের কথা কাটাকাটিতে রেখেই চলে গেল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুও সুকইয়া নামক প্রান্তরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'কুদামাহকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে এসো। যাও! তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে এসো। আল্লাহর শপথ, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক আগন্তুক এসে আমাকে বলল—কুদামাহর সাথে সমঝোতা করে নাও, সে তো তোমার ভাই-ই।' লোকজন এসে কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেতে বললে তিনি অনীহা প্রকাশ করলেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আদেশ দিলেন, তাঁকে যেন জোর করে নিয়ে আসা হয়। নিয়ে আসা হলে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তাঁর জন্য ইসতিগফার করেন।[২৪৫]

আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, শামের কিছু লোক মদপান করে বলতে থাকে—এই মদ আমাদের জন্য হালাল। তারা সে আয়াতটি তাওয়িল (ব্যাখ্যা) করে নিয়েছিল। কিন্তু আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একমত হয়ে বলেন

[২৪৫] মুসান্নাফু আবদির রাযযাক, হাদিস নং : ১৮২৯৫; এর সনদ সহিহ। [নিরীক্ষক]

যে, তাদের তাওবাহ করতে বলা হবে। যদি তাওবাহ করে তাহলে তো ভালোই, নয়তো তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।[২৪৬]

এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়নি। কারণ, তিনি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। যেমন, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন—হে কুদামাহ, তুমি ভুল ব্যাখ্যা করেছ। তিনি সরাসরি বলেননি, মদ হালাল। এমনকি কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আমি কুদামাহকে জিজ্ঞেস করব। সে মদকে হালাল মনে করলে ইরতিদাদের (দ্বীনত্যাগ) কারণে তাকে হত্যা করা হবে। আর হালাল মনে না-করলে চাবুক মারা হবে।' এটি একটু আগে শামের লোকদের ব্যাপারে বর্ণিত বর্ণনারই অংশ।

অতএব, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। সে হয় তাওবাহ করবে, বা করবে না। যদি সে অটল থাকে, তাহলে তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যান্য সাহাবির সামনেই একমত হয়েছিলেন। কোনো সাহাবিই দ্বিমত পোষণ করেননি। কুদামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। আবু বাকর ইবনুল আরাবির বক্তব্য থেকেও এটি বোঝা যায়। কুদামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি বর্ণনার পর তিনি বলেন,

> 'এটা অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছিল। এবং এই বিষয়ের হুকুম কুদামাহর কাছে অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ যাঁদের বোঝানোর যোগ্যতা দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। যেমন, উমার ও ইবনু আব্বাস।'[২৪৭]

হালাল-হারাম নির্ধারণ এবং বিধিবিধান প্রণয়ন করা কেবল আল্লাহরই অধিকার। যে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে, সে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। নিজের গলা থেকে ইসলামের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলবে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ

> 'বলো—আচ্ছা নিজেই লক্ষ করে দেখো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো—তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ

[২৪৬] ইমাম আল-কিয়া আত-তাবারি, আহ, আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৩

[২৪৭] আবু বাকর ইবনুল আরাবি, আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৯

দিয়েছেন, তা কি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ?'[২৪৮]

■ চার

কুরআন হাদিস অথবা প্রমাণিত কোনো সুন্নাহ নিয়ে যে ব্যক্তি ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ
نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

'আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো তবে তারা বলবে—আমরা তো কথার কথা বলছিলাম, কৌতুক করছিলাম। বলো, "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?" বাহানা করো না, তোমরা কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিই ও, তবে কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল অপরাধী।'[২৪৯]

যারা কুরআন বা সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, কুরআন তাদের স্পষ্ট কাফির বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এমনকি ওই ব্যক্তিকেও কাফির বলতে হবে, যে বলবে, 'আল্লাহর দ্বীন সেকেলে, প্রাচীন প্রথা' অথবা মনে করে, এ যুগে অচল, কিংবা যদি বলে, এটা বনে-জঙ্গলে প্রয়োগযোগ্য ব্যবস্থা। কারণ, এই ব্যক্তি এসবের মাধ্যমে নিজেকে প্রভুত্বের এমন স্থানে নিয়ে গেছে যে, সে এখন আল্লাহর প্রণয়নকৃত বিধানের ওপরই হুকুম দিচ্ছে, তাতে ত্রুটি খুঁজছে। এ হিসেবে বাথিস্ট,[২৫০] কমিউনিস্ট[২৫১] ও

---

[২৪৮] সুরা ইউনুস, ১০ : ৫৯

[২৪৯] সুরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৬৫-৬৬

[২৫০] বাথিজম—আরবি البعث (আল-বাস) অর্থ রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ—একটি আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শ, যা একটি ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের ধারণা পোষণ করে। এই আদর্শ জাকি আল-আরসুজি, মিশেল আফলাক ও সালাহ উদ্দিন আল-বিতারের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাথিজম আরব জাতীয়তাবাদ, প্যান আরবিজম, আরব সমাজবাদ ও সামাজিক উন্নয়নের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা একটা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া।) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৫১] কমিউনিস্টরা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সাম্যবাদ বা কমিউনিজম হলো ব্যক্তি মালিকানাহীন, শ্রেণিহীন, শোষণহীন এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা যেখানে সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। এর জনক কার্ল মার্ক্স (মৃত্যু : ১৮৮৩) ও তার সহযোগী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (মৃত্যু : ১৮৯৫)। সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রের উন্নত রূপ। কমিউনিস্টদের মতে সকল সমস্যার সমাধান

জাতীয়তাবাদীদেরও[২৫২] কাফির বলা হবে। তারা তো ইসলামকে প্রাচীন, সেকেলে ব্যবস্থা বলে।

▪ পাঁচ

ইসলামকে সব যুগে, সব স্থানে উপযুক্ত ও কার্যকর মনে না-করাও স্পষ্ট কুফর। এই বিশ্বাস ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যারা বাথিজম ও কমিউনিজমে বিশ্বাসী, তারা মনে করে ইসলাম কোনোভাবেই আধুনিক সমাজ পরিচালনা করতে সক্ষম নয়। ইসলাম সমাজকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাদের মতে ইসলামি অর্থব্যবস্থা এই সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে অক্ষম। এমনকি সমাজকে তার চাওয়া-পাওয়া ও চিত্তবিনোদন যোগান দিতেও ইসলাম অক্ষম। এরা আওয়াজ তোলে—আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় চিন্তাদর্শন গ্রহণ করব এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে[২৫৩] আঁকড়ে ধরব; আর এটা ইসলাম ও ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অথচ এরা জানে না, এই ধরনের মূর্খতার মাধ্যমে তারা মহান রবের ওপর এ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে যে, মার্ক্স আল্লাহর দেয়া অর্থব্যবস্থার চেয়ে সুন্দর অর্থব্যবস্থা তৈরি করেছে! এটা সম্ভব নয় যে, এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে কেউ আল্লাহর দ্বীনে এক মুহূর্তও বাকি থাকবে। বরং সে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক মুক্তির মাঝে। একটি নিরেট জড়বাদী মতবাদ হচ্ছে এই সাম্যবাদ। এরা ধর্মকে আফিম মনে করে। ধর্মকে সবকিছুর উন্নতির অন্তরায় ভাবে। সম্পদ ও ভূমির ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে এরা মানুষকে কেবল শ্রমের যন্ত্র বানিয়ে ছেড়েছে। [ভাষা-সম্পাদক]

[২৫২] জাতীয়তাবাদীরা ভাষা কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সম্পর্কের ধরন নির্ধারণ করে। দ্বীন-ধর্ম এদের কাছে কোনো কিছুর মাপকাঠি হতে পারে না। ইসলামের 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র (আল্লাহর জন্য মিত্রতা এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কহীনতা) আকিদাহকে এরা ঘৃণা করে। মূলত ইমান ও তাওহিদই মুমিনদের সম্পর্ক নির্ধারণের আসল ভিত্তি। আল্লাহ বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সাথিদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো।"' (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৪) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৫৩] বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। কার্ল মার্ক্সকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক বলা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

ভ্রান্ত যুক্তি

এবার আমরা ওই ব্যাখ্যাগুলো উপস্থাপন করব, যেগুলো কিছু আলিম বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা এই আয়াতগুলোতে চার ধরনের ব্যাখ্যা করেন :

- এক

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে, সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।'[২৫৪]

এই আয়াতে বর্ণিত ইমানের উদ্দেশ্য হলো ইমানের পূর্ণাঙ্গতা। অর্থাৎ আয়াতে যে বলা হয়েছে—তারা ইমানদার হতে পারবে না—এর উদ্দেশ্য এই নয়, যে ব্যক্তি নবির শরিয়াতের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার ন্যস্ত করবে না, তার পুরো ইমানই চলে যাবে, বরং এ আয়াতে ইমানের পূর্ণাঙ্গতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাহলে অর্থ হবে, তার ইমান পূর্ণ ইমান বলে গণ্য হবে না।

এই বক্তব্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং কুরআনি আয়াতের ধারাবাহিক আলোচনায় অভিধান ও উসুলের আলোকে এর খণ্ডনও করেছি।

- দুই

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'[২৫৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, এটা এমন কুফর নয় যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে; বরং এখানে উদ্দেশ্য কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর)।[২৫৬]

---

[২৫৪] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

[২৫৫] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

[২৫৬] ছোট কুফরের কারণে কেউ একেবারে কাফির হয়ে যায় না, তবে তা কবিরা গুনাহ এবং হারাম। ছোট কুফরের কিছু উদাহরণ : মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম করে কান্না করা, কারও বংশে

- তিন

কেবল ওই ব্যক্তির ওপরই কুফরের হুকুম দিতে হবে, যে ব্যক্তি কুরআন ও প্রমাণিত সুন্নাহর কোনো অংশ অস্বীকার করবে বা কোনো হারাম কাজকে হালাল মনে করে করবে। নয়তো তাকে কাফির বলা যাবে না।

- চার

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির, ...তারাই যালিম, ...তারাই ফাসিক।'[২৫৭]

তারা বলেন, এই আয়াত কিতাবধারীদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

মুক্তির অপনোদন

আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি আমাদের অন্তরে সত্য ঢেলে দেবেন। সত্য বলা, প্রকাশ করা, সত্যের অনুসরণ করার জন্য সাহায্য করবেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যাখ্যার দিকগুলো উন্মোচন করে দেবেন।[২৫৮] আমিন।

- যুক্তি-২ : কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর)

যারা আয়াতে উল্লিখিত কুফরকে ছোট কুফর মনে করেন, তাদের দলিলের উৎস হলো ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর কিছু ছাত্রের অভিমত। সেখান থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি :

১. তাউস (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, 'তারা যা মনে করছে এটা সেই কুফর নয়। তা এমন কোনো কুফর নয়, যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেবে। উপর্যুক্ত আয়াতে ছোট কুফরই

দেওয়া ইত্যাদি। অপরদিকে বড় কুফরের কারণে ব্যক্তির ঈমানই নষ্ট হয়ে যায় এবং সে কাফিরে পরিণত হয়। [অনুবাদ-সম্পাদক]

[২৫৭] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৪, ৪৫, ৪৭

[২৫৮] প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। [অনুবাদ সম্পাদক]

উদ্দেশ্য।'[২১১]

[২১১] ইমাম হাকিম নিশাপুরি, আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, হাদিস নং : ৩২১৯। যদিও ইমাম হাকিম এবং ইমাম যাহাবি একে সহিহ বলেছেন, সঠিক কথা হচ্ছে এই বর্ণনা সমস্যাযুক্ত। এর সনদে তাউস থেকে বর্ণনাকারী হিশাম ইবনু হুজাইর নামক একজন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে জারহ-তাদিলের ইমামদের থেকে ইতিবাচক-নেতিবাচক দুই ধরনের মন্তব্যই বর্ণিত রয়েছে। যেমন, ইমাম ইজলি ও ইবনু সাদ তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। ইমাম আবু হাতিম রাযি বলেছেন, তাঁর হাদিস লেখা যাবে। অপরদিকে ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন, ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ আল-কাত্তান, আলি ইবনুল মাদিনি, আহমাদ বিন হাম্বল, উকাইলি, ইবনু হাযমসহ অধিকাংশ ইমাম তাঁকে দয়িফ বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, নেশা করার অপরাধে মক্কায় তাঁর ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছিল। অপরদিকে ইমাম বুখারি সহিহ গ্রন্থের পাঁচ জায়গায় সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলনের প্রতিজ্ঞাসংবলিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এর মাঝে একটি হাদিস (নং : ৬৭২০) হিশাম ইবনু হুজাইরের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি বলেছেন, তিনি সদুক (সিকাহ ও দয়িফের মধ্যবর্তী স্তর), তাঁর ওয়াহম (ভ্রম) হতো। যেহেতু হাদিস বর্ণনায় তাঁর ভ্রম হতো, তাই উক্ত বর্ণনাও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সনদে দেখা যায়—ইবনু আব্বাসের উক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন তাউস। আর তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন হিশাম। অথচ স্বয়ং তাউসের ছেলে আবদুল্লাহ এটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তাউসের ছেলে নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ , قَالَ: هِيَ كُفْرٌ , قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

'ইবনু আব্বাসকে আল্লাহর কথা "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—এটা কুফরই। তাউসের ছেলে বলেছেন—এটা আল্লাহ, মালায়িকাহ, তাঁর কিতাবাদি এবং রাসুলগণের ব্যাপারে কুফরি করার মতো কুফর নয়।' (ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনি, তাফসির আবদুর রাযযাক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০, হাদিস নং : ৭১৩; ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি, তাযিমু কাদরিস সালাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২১, হাদিস নং : ৫৭০; এর সনদ সহিহ)।

এটি স্পষ্ট যে, উক্ত সহিহ সনদে বর্ণিত ইবনু আব্বাসের বক্তব্যটি আল্লাহর বিধান ছেড়ে ভিন্ন আইনে বিচারকারীদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কুফরি প্রমাণ করছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিও ইবনু আব্বাসের নয়, বরং তাউসের ছেলের। ইমাম তাবারি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের আরেকটা বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। সেটা হলো,

من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق

'ইবনু আব্বাস বলেছেন, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেটা কেউ অস্বীকার করলে কাফির হবে। আর যদি কেউ স্বীকার করে, কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার করে না, সে যালিম ও ফাসিক।"' (তাফসির তাবারি : ৮/৪৬৮))।

উক্ত বর্ণনায় একাধিক সমস্যা বিদ্যমান। যথা : ১. ইমাম তাবারির উসতায মুসান্না মুহাদ্দিসদের কাছে

২. ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—যদিও এটা কুফর, কিন্তু এটা বাস্তব কুফরির মতো নয়, যে আল্লাহ ও আখিরাতের ব্যাপারে কুফর করে।[২৬০]

৩. আতা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত কুফর দ্বারা ছোট কুফর উদ্দেশ্য। যুলম দ্বারা বড় যুলমের চেয়ে নিম্নস্তরের যুলম উদ্দেশ্য। ফিসক দ্বারা বড় ফিসকের চেয়ে নিম্নস্তরের ফিসক উদ্দেশ্য।'[২৬১]

৪. তাউস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন—আয়াতে উল্লিখিত কুফর এমন কোনো কুফর নয়, যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।[২৬২]

মাজহুল, তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত। যদিও ইবনু কাসির তাঁর প্রশংসা করেছেন। ২. মুসান্নার উসতায আবু সালিহের (আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ) ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি দয়িফ। এমনকি অনেকে এও বলেছেন, সে হাদিস বানিয়ে বর্ণনা করত। ইবনু হাজার বলেছেন, তিনি সদুক, তবে খুব বেশি ভুল করেন। ৩. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনাকারী আলি ইবনু আবি তালহা। তিনি ইবনু আব্বাসের দেখা পাননি এবং তাঁর থেকে সরাসরি কোনো কিছু শোনেনওনি। তাই, সনদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে। এতসব দোষে দুষ্ট একটা বর্ণনা পূর্বোল্লিখিত সহিহ বর্ণনার বিপরীতে যায় না। এমনকি একাধিক দয়িফ হলেও বিপরীতে সহিহ বর্ণনা থাকলে সহিহটাই গ্রহণযোগ্য হয়। [নিরীক্ষক]

[২৬০] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি, তাযিমু কাদরিস সালাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২১, হাদিস নং : ৫৭১; এর সনদ সহিহ। তবে এটি ইবনু আব্বাসের উক্তি নয়; বরং তাউসের ছেলে আবদুল্লাহর বক্তব্য। বর্ণনাটি মূলত এর পরবর্তী কোনো রাবির (বর্ণনাকারী) মাধ্যমে মুদরাজ হয়েছে। মুদরাজ হলো, রাবির ব্যাখ্যা বা বক্তব্যকে মূল হাদিসের ভাষ্যের সাথে একাকার করে বর্ণনা করা। উসুলুল হাদিসের পরিভাষায় এই কাজটাকে ইদরাজ বলে। আর হাদিসটিকে বলা হয় মুদরাজ। সনদ (বর্ণনাসূত্র) ও মতন (মূলপাঠ) দুই জায়গায়ই ইদরাজ হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতনেই ইদরাজ হয়। এটা মুদরাজ হওয়ার প্রমাণ হলো, এই বর্ণনাটাও তাউসের ছেলের সূত্রেই বর্ণিত। অথচ অন্য একটি সহিহ বর্ণনায় ইবনু আব্বাস এবং তাউসের ছেলের বক্তব্য আলাদাভাবে উল্লেখ রয়েছে, যা আমরা পূর্বোক্ত টীকায় স্পষ্ট করে দিয়েছি। [নিরীক্ষক]

[২৬১] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি, তাযিমু কাদরিস সালাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২২, হাদিস নং : ৫৭৫; এর সনদ সহিহ। আতার উক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করার পর ইমাম মারওয়াযি বলেন, 'কখনো কাফিরকে যালিম বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় শিরক মহাযুলম।" আবার কখনো মুসলিম পাপীকেও যালিম বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি।" তাই, কিছু যুলুম মিল্লাতুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আর কিছু যুলুম বের করে না।' [নিরীক্ষক]

[২৬২] ইমাম তাবারি, তাফসিরে তাবারি : ১/৬৫৩; ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি, তাযিমু কাদরিস সালাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২২, হাদিস নং : ৫৭৪; এর সনদ সহিহ। [নিরীক্ষক]

▪ খণ্ডন

আমরা ইবনু আব্বাসকে খণ্ডন করছি না। নবির সাহাবি ও প্রিয়পাত্রদের শানে কোনো অমার্জিত আচরণ এবং তাঁদের সামনে স্পর্ধা দেখানো থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এ তো ওই ব্যক্তিদের খণ্ডন, যারা ইবনু আব্বাসের কথার মাধ্যমে দলিল দিয়েছেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

১. এমন মুসলিমের অবস্থা ইবনু আব্বাসের কল্পনাতেও দৃশ্যমান ছিল না, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সত্য বলে এবং সাক্ষ্য দেয়, আবার একই সাথে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বানানো বিধানের সমান মনে করে সন্তুষ্ট থাকে। অধিকন্তু যখন সেই ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের ওপর কোনো কাফিরের বিধানকে প্রাধান্য দিচ্ছে! আমার মনে হয় না কোনো সাহাবি বা তাবিয়ি তার কুফর ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আগেই ফায়সালা দিয়েছিলেন এমন সালিশ নিয়ে এক মুনাফিক উমারের কাছে আসলে তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওই মুনাফিকের রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করলেন। কারণ, এই কাজের মাধ্যমে সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার-ফায়সালার ওপর উমারের বিচারকে প্রাধান্য দিচ্ছিল। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর।[২৬৩]

২. সাহাবা কিরাম সেই বিচারকের অবস্থা নিয়ে বলেছিলেন, যেই বিচারক ঘুষ নিয়ে কোনো একটি বিচারে আল্লাহর শরিয়াহ অনুযায়ী ফায়সালা করে না। তাঁরা এমন ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করেননি, যারা আল্লাহর শরিয়াহ পরিবর্তন করে সে স্থানে নিজের চাহিদা অনুযায়ী বিধান প্রয়োগ করছে। ইবনু মাসউদের বক্তব্যই এর দলিল। এটি বর্ণনা করেছেন আলকামাহ ও আসওয়াদ (রাহিমাহুমাল্লাহ)। তাঁরা উভয়েই ইবনু মাসউদকে ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, এটা হারাম। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এটা যদি বিচারের ক্ষেত্রে হয়?' তখন তিনি বললেন—বিচারের ক্ষেত্রে তো কুফর হবে। সাহাবা কিরাম উক্ত মতামত ওই বিচারকের ব্যাপারে দিয়েছিলেন, যে কিনা ঘুষ নিয়ে কোনো একটি বিচারে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করে না। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

---

[২৬৩] তাফসির কাসিমি : ৫/৫৫৩১

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দিয়ে বিচার করে না, তারাই কাফির।'[২৬৪]

কেউই উল্লিখিত বিচারকের এ কুফরি কাজকে (ঘুষ নেয়া) এমন কুফর বলেনি, যা বিচারককে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। বরং এটা ছোট কুফর অথবা আমলগত কুফর, আকিদাহগত কুফর নয়।

৩. ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খারিজিদের[২৬৬] ফিতনার সময় বেঁচে ছিলেন। এই খারিজি সম্প্রদায় কবিরা গুনাহের কারণে তাকফির[২৬৭] করত। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, এরা সাহাবা কিরামকেই কাফির বলত! ফলে এ ধরনের বক্তব্য তখন খুবই দরকার ছিল, যেন তাদের এই চরমপন্থার প্রতিরোধ হয়ে যায়। বর্তমানে মুসলিমরা যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, ইসলামি আইনব্যবস্থাকে মূল থেকে পরিবর্তন করা হচ্ছে, ইসলামি বিধানের স্থানে কাফিরদের চাহিদা ও মতামতকে নতুন দ্বীন হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে, আর এই নতুন দ্বীন যেভাবে মানুষের মান-সম্মান, সম্পদ ও জীবনের ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে—সাহাবা ও তাবিয়িদের ওইসব অভিমত কখনোই এদের পক্ষে ছিল না।

মুসলিম সমাজে আল্লাহর বিধানের স্থানে মানুষের বানানো বিধান প্রতিস্থাপনের বিষয়টা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় তাতারদের যুদ্ধের সময়ে। যখন হালাকু খান কুরআন-সুন্নাহর স্থানে 'ইয়াসাক' বাস্তবায়ন করতে চাইল, তখন ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) জীবিত ছিলেন। তিনি তখন নিচের আয়াতের অধীনে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ফাতওয়া দেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'[২৬৮]

---

[২৬৪] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

[২৬৫] ইমাম তাবারি, জামিউল বায়ান, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৩২; এর সনদ সহিহ। [নিরীক্ষক]

[২৬৬] সাহাবা কিরামের পারস্পরিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে খারিজি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। খারিজিদের আকিদাহ হলো, কবিরা গুনাহ করলে কোনো মুসলিম কাফির হয়ে যায়। এ জন্য তারা কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিমদের তাকফির করত। এমনকি খারিজিরা বিশিষ্ট সাহাবিদেরও কাফির বলত। খারিজিদের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদল ও ভ্রান্ত আকিদাহ বিদ্যমান। [ভাষা-সম্পাদক]

[২৬৭] তাকফির হলো কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা। [ভাষা-সম্পাদক]

[২৬৮] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫০

ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'আল্লাহ ওই ব্যক্তি ও তার বিধানকে অস্বীকার করছেন, যে ব্যক্তি সমস্ত কল্যাণ ও অকল্যাণকর বিষয়ে আল্লাহর অকাট্য বিধান থেকে বের হয়ে এমন কিছু মতামত ও পরিভাষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যা কিছু মানুষ আল্লাহর শরিয়াতের ওপর ভিত্তি না করে প্রণয়ন করেছে। ঠিক যেমন জাহিলি যুগের লোকেরা করত। তারা এমন কিছু ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিধিবিধান দ্বারা ফায়সালা করত, যেগুলো তাদের মতামত ও চাহিদা অনুযায়ী নিজেরাই প্রণয়ন করেছিল। এভাবে তাতাররাও তাদের প্রধান চেঙ্গিস খান থেকে নেয়া সংবিধানের মাধ্যমে ফায়সালা করে। সে এই "ইয়াসাক" তাদের জন্য প্রণয়ন করেছিল।
>
> ইয়াসাক বিভিন্ন আইন-বিধানের সমষ্টি। সেগুলো ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে নেয়া। এর মাঝে এমন অনেক বিধান আছে, যেগুলো সে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদা অনুপাতে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে তার সন্তান-সন্ততির মাঝে অনুসরণীয় সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই "ইয়াসাক" সংবিধানকে তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানের ওপরও প্রাধান্য দিত। অতএব, যে-ই তাদের মতো এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হবে, সে-ই কাফির বলে গণ্য হবে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। ছোট-বড় সব বিষয়ে ফায়সালাকারী একমাত্র আল্লাহ।'[২৬৯]

▪ যুক্তি-৩ : কুফরের জন্য জুহুদ (অস্বীকার) ও ইসতিহলাল (বৈধ মনে করা) শর্ত[২৭০]

এই মতের আলিমদের দাবি, এ আয়াতের মাঝে কিছু শব্দ লুক্কায়িত (উহ্য) রয়েছে। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হবে, কুরআন প্রত্যাখ্যানপূর্বক এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২৬৯] তাফসির ইবনু কাসির : ২/৭৬

[২৭০] অর্থাৎ, কাজটা বড় কুফর হওয়ার জন্য ওই কাজটি হালাল বলে বিশ্বাস করতে হবে বা অন্তরে অস্বীকার করতে হবে, তা শর্ত নয়। যেমন, কেউ আল্লাহকে গালি দিলো। এখন সে এই গালি দেয়াকে হালাল মনে করল কি না সেটা ধর্তব্য নয়। এ কাজটাই স্বয়ং কুফর। এখানে বিশ্বাস ধর্তব্য নয়। (আরও দেখুন : শাইখ আসিম আল-বারকাওয়ি, হ্যাযিহি আকিদাতুনা; শাইখ ড. আবদুর রহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, 'আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ : আহওয়ালুহু ওয়া আহকামুহু', বাংলা সংস্করণ; শাইখ আলি বিন খুদাইর আল-খুদাইর, মুযাক্কিরাতুন ফি শারহি নাওয়াকিদিল ইসলাম, বাংলা সংস্করণ) [ভাষা-সম্পাদক]

ওয়াসাল্লামের কথা অস্বীকারপূর্বক যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না, সে কাফির বলে গণ্য হবে। তাদের দাবি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) এই অভিমত দিয়েছেন।[২৭১]

অথচ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হাসান বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'উক্ত আয়াতের হুকুম সাধারণভাবে এমন সব ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে বিশ্বাস বা বৈধ মনে করে আল্লার নাযিলকৃত বিধান দিয়ে ফায়সালা করবে না—চাই সে মুসলিম, ইহুদি অথবা যেকোনো কাফিরই হোক না কেন।'[২৭২]

ইবনুল আরাবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'কেউ যদি নিজের বিধান দিয়ে ফায়সালা করে, আর মনে করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাহলে এটা তাবদিল (শরিয়াহ পরিবর্তন) হবে, যা কুফরকেই আবশ্যক করে। আর সে প্রবৃত্তিতাড়িত বা অন্যায়ভাবে করলে সেটা কবিরা গুনাহ হবে। এটা ইসতিগফারের মাধ্যমে ক্ষমাযোগ্য। গুনাহগারদের ক্ষমাপ্রাপ্তির ব্যাপারে এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মূলনীতি।'[২৭৩]

এ মতের আলিমরা বলতে চান, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরিয়াহকে বাদ দিয়েছে, সে স্পষ্টভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকারপূর্বক আল্লাহর শরিয়াহকে বাদ দেয়ার কথা না-বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাকফির করা যাবে না।

- খণ্ডন

১. আয়াতে কিছু বিষয় লুক্কায়িত (উহ্য) রয়েছে, এমন দাবির স্বপক্ষে দলিল থাকা প্রয়োজন। শব্দের প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ করা বা মূল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য এমন আলামত থাকা আবশ্যক, যা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার বিষয়কে প্রাধান্য দেবে। মূলনীতি অনুযায়ী আয়াতকে তার মূল অর্থের ওপরেই গ্রহণ করা হবে, যতক্ষণ না ভিন্ন অর্থ নেয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায়।

২. যখন কোনো ব্যক্তির কাজ কুফর ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখছে না, তখন

---

[২৭১] তাফসির কুরতুবি : ৬/১১০। ইমাম কুরতুবি আপত্তিকারীদের বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের দাবির স্বপক্ষে ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদের উদ্ধৃতি সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। [নিরীক্ষক]

[২৭২] তাফসির কুরতুবি : ৬/১১০। এটারও কোনো সনদ উল্লেখ করা হয়নি। [নিরীক্ষক]

[২৭৩] ইবনুল আরাবি, আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৭। এটা ইমাম কুরতুবিরও বক্তব্য (তাফসির কুরতুবি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১১)। [নিরীক্ষক]

আমলকারীকে তাকফির করার জন্য তার সুস্পষ্ট মৌখিক স্বীকারোক্তি আবশ্যক নয়। উলামা কিরাম একমত, যে ব্যক্তি মূর্তির সামনে সাজদাহ করবে, সে কাফির। তার অন্তরে কী আছে না আছে, তাঁরা সেগুলো জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করেন না। এমনিভাবে যে কুরআনকে কোনো নোংরা স্থানে ছুড়ে ফেলবে, সেও সর্বসম্মতভাবে কাফির। অতএব, মানুষের বানানো দ্বীনকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীনের স্থানে প্রতিস্থাপন করাটা এমন কাজ, যা কুফর ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। আর আমলকারীকে জিজ্ঞেসেরও প্রয়োজন নেই যে, সে কি এই কাজ হালাল মনে করে করছে না কি হারাম মনে করছে। উসতায হাসানুল বান্না[২৭৪] তাঁর 'আল-উসুলুল ইশরিন'-এ বলেন,

> 'যে মুসলিম তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং সাক্ষ্যের দাবি অনুযায়ী আমল করে, ফরয বিধানগুলো মেনে চলে, তার কোনো মত বা গুনাহের কারণে আমরা তাকে কাফির বলব না। তবে সে যদি কোনো কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে বা যরুরিয়াতুদ-দ্বীনের কোনো এক বিধান অস্বীকার করে, কুরআনুল কারিমের স্পষ্ট কোনো হুকুমকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে—কিংবা এমন কোনো পন্থায় ব্যাখ্যা করে, যা আরবি ভাষারীতির কোনো পদ্ধতিই সমর্থন করে না অথবা এমন কোনো কাজ করে, যার ব্যাখ্যা কোনোভাবেই কুফরি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না—তাহলে তাকে কাফিরই বলতে হবে।'[২৭৫]

আল্লাহর শরিয়াহর জায়গায় নেপোলিয়নের তৈরি করা আইনকানুন অথবা অন্য কোনো আইনকানুনকে প্রতিস্থাপন করা এবং মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধন-সম্পদ ও রক্তের ক্ষেত্রে এসব মতবাদকে বিধান ও ফায়সালা হিসাবে মেনে নেয়া এমন ঘৃণ্য কাজ, যাকে কুফর ছাড়া অন্য কোনো হুকুম দেয়া সম্ভব নয়। এটা তো ওই বিচারকের মতো নয়, যে কিনা আল্লাহর শরিয়াহকে স্বীকার করে নিল, তারপর প্রবৃত্তির তাড়না, ঘুষের লোভ অথবা আত্মীয়তার টানে আল্লাহর বিধানমতে বিচারের ফায়সালা দেয়নি। বরং এখানে বিষয়টা ওই ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহর দ্বীনকে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গন থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং নতুন এক দ্বীন

---

[২৭৪] শাইখ হাসান আহমাদ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ আল-বান্না [১৪ অক্টোবর, ১৯০৬—১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯] : ইখওয়ানুল মুসলিমিন (Muslim Brotherhood) নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। হাসান আল-বান্না মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে মিশরের নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে হত্যা (শহিদ) করে। [ভাষা-সম্পাদক]

[২৭৫] মাজমুয়াতুর রাসায়িল, পৃষ্ঠা : ১১

মেনে নিল। সেটা তরবারি আর বোমার আঘাতে মুসলিমদের গলায় লটকিয়ে দিলো, যেন মুসলিমরা এর সামনে নির্বাক আনুগত্য প্রকাশ করে একে স্বীকার করে নেয়।

৩. যেগুলো তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছে, সেগুলোতে অনুসন্ধান করলে আপনিও তাদের দলিলের জবাব দিতে পারবেন। দেখুন, তারা ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হাসান বাসরির এই কথার মাধ্যমে দলিল দিচ্ছেন, 'উক্ত আয়াতের হুকুম সাধারণভাবে এমন সব ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে বিশ্বাস বা বৈধ মনে করে আল্লার নাযিলকৃত বিধান দিয়ে ফায়সালা করবে না—চাই সে মুসলিম, ইহুদি অথবা যেকোনো কাফিরই হোক না কেন।'[২৭৬]

এই যে শর্ত—বিশ্বাস বা বৈধ মনে করা—এ শর্ত মূলত ইবনু আব্বাস বা হাসান বাসরি কারোরই নয়; বরং এটা ইমাম কুরতুবির কথার অংশ। ইবনু মাসউদ ও হাসান আল-বাসরির ভাষ্য বলে দলিল দেয়াটাই ভুল। আর তারা যে ইবনুল আরাবির অভিমত দিয়ে দলিল দিয়েছেন, সেটাও আমাদেরই দলিল। কারণ, ইবনুল আরাবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলছেন, 'কেউ যদি নিজের বিধান দিয়ে ফায়সালা করে, আর মনে করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাহলে এটা তাবদিল (শরিয়াহ পরিবর্তন) হবে, যা কুফরকেই আবশ্যক করে।'[২৭৭]

ইবনুল আরাবির বক্তব্যের দিকে একটু লক্ষ করুন। তিনি বলেছেন, এটাই তাবদিল (শরিয়াহ-পরিবর্তন), যা কুফরকেই আবশ্যক করে। আর এই তাবদিলই কুফর। এখানে দুটোর মাঝে কোনো সমন্বয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মানুষই এই দ্বীন পরিবর্তনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন, অন্য কোন দ্বীনের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করা, আল্লাহর শরিয়াহর স্থানে অন্য কোনো শরিয়াহকে প্রতিস্থাপন করা এবং আল্লাহর বিধানের স্থানে অন্য কোনো বিধান প্রতিষ্ঠা করা—এসব এমন কাজ, যা কুফরকেই আবশ্যক করে। যেমন বলেছেন ইবনুল আরাবি।

▪ যুক্তি-৪ : হাকিমিয়াহসংক্রান্ত আয়াতগুলো ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, আমাদের জন্য নয়।

যারা এই যুক্তির দিকে পা বাড়িয়েছেন, তারা নিচের আয়াতগুলো দিয়ে প্রমাণ দিয়ে থাকেন :

১. দাহহাক থেকে বর্ণিত, 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচারকাজ পরিচালনা

[২৭৬] তাফসির কুরতুবি : ৬/১৯০

[২৭৭] আহকামুল কুরআন : ৩/২১০

করে না, তারাই কাফির, ...যালিম, ...ফাসিক।' এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে আহলুল কিতাবের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) বিরুদ্ধে।[২৭৬]

২. আবু সালিহ থেকে বর্ণিত—এই আয়াতের কোনো অংশই মুসলিমদের ব্যাপারে নয়, বরং আহলুল কিতাবের ব্যাপারে।[২৭৭]

৩. আবু মিজলায লাহিক ইবনু হামিদ আশ-শাইবানি আস-সাদুসির কাছে বনু আমর ও বনু সাদুসের কিছু লোকজন এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু মিজলায, আপনি আল্লাহর এই আয়াতের—যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনব্যবস্থা দিয়ে শাসন করবে না, তারা কাফির, ...তারাই যালিম, ...তারাই ফাসিক—ব্যাপারে কী বলেন? এটি কি ঠিক আছে?' তিনি বললেন—হাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি তারা মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা দেবে?' তিনি জবাব দিলেন, 'এটিই তাদের দ্বীন, যা তারা পালন করছে, তারা এর বাণী প্রচার করে এবং এই দ্বীনের দিকেই আহ্বান করে। তারা যদি এর বিন্দু পরিমাণ ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা জানে যে, তারা গুনাহগার হবে। তখন তারা বলে উঠল—কখনো নয়, বরং আপনি এর সঠিক বিধান বলতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'আমি এমনটা মনে করি না, বরং তোমরাই এটা মনে করে থাক। আর

---

[২৭৮] তাফসির তাবারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৪৬, বর্ণনা নং : ১২০২৪। বক্তব্যটা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির। দাহহাকের উক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ছাত্র আবু হাইয়ান আত-তাইমি। দাহহাক নামে একাধিক ব্যক্তি থাকলেও এখানে উল্লিখিত ব্যক্তিটি হলেন দাহহাক ইবনুল মুনযির ইবনি জারির ইবনি আবদিল্লাহ। কারণ, আবু হাইয়ান তাঁরই ছাত্র এবং তাঁর থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী ব্যক্তি। ইবনু হাজার দাহহাককে মাকবুল বলছেন। কিন্তু আলি ইবনুল মাদিনি বলেছেন, মুহাদ্দিসরা তাকে চেনেন না। 'তাহরিরু তাকরিবিত তাহযিব'-এর লেখকবৃন্দও অর্থাৎ শুয়াইব আরনাউত এবং বাশশার আওয়াদ তাকে মাজহুল (অজ্ঞাত) বলেছেন। (তাহরিরু তাকরিবিত তাহযিব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৯, রাওয়ি নং : ২৯৭৯)। তাই বলা যায়, এটা একজন মাজহুল ব্যক্তির বক্তব্য। [নিরীক্ষক]

[২৭৯] প্রাগুক্ত, বর্ণনা নং : ১২০২৩; এই বর্ণনা সমস্যাযুক্ত। এর সনদে উল্লেখিত এক বর্ণনাকারীর নাম মুসান্না ইবনু ইবরাহিম। ইমাম তাবারি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কেউই বর্ণনা করেননি। ইবনু কাসির তাঁর প্রশংসা করলেও অনেকেই তাঁকে এই কারণে মাজহুল বলেছেন। এই সনদে আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম। তিনি আবু হাইয়ান থেকে, আর তিনি আবু সালিহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এখানে মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম নামক ব্যক্তির ব্যাপারে প্রবল ধারণা রয়েছে যে, তিনি কুফার মুহাম্মাদ আল-আসাদি হবেন। তার উসতায আবু সালিহও কুফার লোক এবং দুজনের মৃত্যুতেও প্রায় ৫০ বছরের ব্যবধান রয়েছে, যা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয়। লোকটি সেই ব্যক্তি হলে তার বর্ণনা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মুহাদ্দিসদের মতে তিনি পরিত্যাজ্য এবং মিথ্যাবাদী। [নিরীক্ষক]

সংকীর্ণতা সৃষ্টি করো না। এই আয়াত অবশ্যই ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে।'[২৮০]

তাদের চতুর্থ দলিল বারা ইবনু আযিব, হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান, ইবনু আব্বাস, আবু মিজলায, আবু রাজা, ইকরিমাহ ও হাসান আল-বাসরি থেকে বর্ণিত হয়েছে।[২৮১]

■ খণ্ডন

১. আয়াতটিতে مَنْ (মান) শব্দের মাধ্যমে অর্থের মাঝে ব্যাপকতা এসেছে। مَنْ শব্দটি অর্থের ব্যাপকতার জন্য শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর তাফসিরশাস্ত্রের মূলনীতি হলো—শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য। বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে হুকুমকে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

চুরির শাস্তিসংবলিত আয়াত নাযিল হয়েছিল সাফওয়ানের চাদর বা ঢাল-চোরের ব্যাপারে। হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল লিয়ানের[২৮২] আয়াত। যিহারের[২৮৩]

---

[২৮০] প্রাগুক্ত, বর্ণনা নং : ১২০২৫; এর সনদ সহিহ। আবু মিজলায একজন বিশিষ্ট তাবিয়ি। তাঁর গোত্রের লোকেরা খারিজি ছিল। তারা তৎকালীন মুসলিম শাসকদের তুচ্ছ কারণেই তাকফির করত। তাদের প্রশ্নের জবাবে আবু মিজলাযপ্রদত্ত এমন বক্তব্যের কারণ হলো, সে সময়ের মুসলিম শাসকরা প্রকৃতই ইমানদার এবং আল্লাহর আইনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। তারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে ভিন্ন আইন প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন না। যদিও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ছিল আহলুল কিতাব, কিন্তু এর হুকুম ব্যাপক এবং আয়াতে ব্যাপকতা বোঝায় এমন শব্দই উল্লেখ রয়েছে। আর আবু মিজলাযের জবাবেও এমন কথা নেই যে, আয়াতটি শুধু আহলুল কিতাবদের জন্যই প্রযোজ্য। বরং তিনি বলেছেন—ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নাযিলের প্রেক্ষাপটটি শুধু বলেছেন। তাঁর এই ধরনের জবাব মূলত খারিজিদের অতি-বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ছিল। [নিরীক্ষক]

[২৮১] তাফসির ইবনু কাসির : ২/১৬। হাসান আল-বাসরি থেকে বরং এর বিপরীত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—এই বিধান আমাদের ওপরও ওয়াজিব। (তাফসির তাবারি : ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং : ১২০৬০; এর সনদ সহিহ)। [নিরীক্ষক]

[২৮২] লিয়ান : স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ তোলে, কিংবা স্ত্রীর গর্ভের সন্তান তার নিজের নয় বলে দাবি করে, আর স্ত্রী তাতে অস্বীকার করে এবং স্বামীর পক্ষেও কোনো সাক্ষী না-থাকে, এমতাবস্থায় বিচারক উভয়কে শপথ করাবে। প্রত্যেকেই নিজের সত্যবাদিতার ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে পঞ্চমবারে মিথ্যাবাদী হওয়ার ওপর অভিশাপ দিবে। তারপর কারও ওপরেই হদ প্রয়োগ না করে বিচারক তাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। (সুরা আন-নূর, আয়াত : ৪-৯)। [নিরীক্ষক]

[২৮৩] যিহার : স্বামী তার স্ত্রীকে এমন মাহরাম মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য দেয়া, যাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিয়ে হারাম, কিংবা মাহরাম মহিলাদের এমন অঙ্গের সাথে সাদৃশ্য দেয়া, যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম। যেমন, স্ত্রীকে এভাবে বলা—তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতোই, কিংবা মায়ের পিঠ, পেট বা উরুর মতো। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যায় এবং তাকে স্পর্শ

আয়াত নাযিল হয়েছিল খাওলাহ বিনতু সালাবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর স্বামী আওস ইবনু সামিতের ব্যাপারে।

আমরা যদি কুরআনের আয়াতের বিধানকে তার অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলি, তাহলে বলতেই হয়, কুরআনি বিধানের প্রয়োগ নির্দিষ্ট সময় বা ব্যক্তি ছাড়া কারও ওপরই প্রযোজ্য নয়। সে ক্ষেত্রে কুরআনি বিধানের বাস্তবায়ন শুধু অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপটেই আবদ্ধ থাকবে, অথচ কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক শরিয়াহ (আইনব্যবস্থা), যা বলবৎ থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। কুরআনের বিধান ব্যাপক শব্দমালা এবং ব্যাপক প্রয়োগযোগ্য দলিলাদির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে কিয়ামাত পর্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যার শিকার হবে, সবক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন করা যায়। এ জন্য আয়াতের শব্দ ব্যাপক রাখা হয়েছে।[২৮৪]

২. কিতাবধারীদের জন্য এই আয়াতগুলো নির্দিষ্ট হওয়ার দাবির স্বপক্ষে প্রাধান্যপ্রাপ্ত দলিলের প্রয়োজন। কারণ, নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে কোনো ধরনের দাবি বা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই আয়াত তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।[২৮৫]

৩. এ ক্ষেত্রে সাহাবা কিরাম ও তাবিয়িদের প্রচুর বর্ণনা রয়েছে।[২৮৬] সেগুলো আয়াতের

করাও বৈধ নয়। তবে স্ত্রীকে ফেরত পেতে চাইলে এর কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা হলো, একজন ইমানদার দাস মুক্তকরণ। তা সম্ভব না হলে ধারাবাহিক দুই মাস সাওম রাখা। আর তাতেও সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। (সুরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত : ৩, ৪)। তারপর স্ত্রী হালাল হয়ে যায়। এটা হলো মাহরামের সাথে নিজ স্ত্রীকে সাদৃশ্যদানের শাস্তি। [নিরীক্ষক]

[২৮৪] অর্থাৎ কুরআনের আয়াতকে অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপটের সাথেই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা হয়নি। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি যুগে আল্লাহর আয়াত প্রযোজ্য। [ভাষা-সম্পাদক]

[২৮৫] ইমাম শাতিবি বলেন, 'শরিয়াহর মাকসাদ (উদ্দেশ্য) সম্পর্কে সালাফরা ভালো করেই জানতেন। পাশাপাশি তাঁরা ছিলেন আরব। তাঁদের বুঝ ছিল এই যে, কুরআনের আয়াতগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা ব্যাপক (আম)। যদিও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ভিন্ন কিছু নির্দেশ করে। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁদের অবস্থান ছিল আয়াতের শব্দের প্রকাশ্য অর্থের সার্বিক প্রয়োগকে প্রাধান্য দিতে হবে।' (আল-মুওয়াফাকাত : ৪/৩৪) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৮৬] জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমদের সুপ্রসিদ্ধ মত এবং তাফসিরশাস্ত্রের উসুলও এটি যে, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট হলেও এর হুকুম ব্যাপক হয়। এক লোক এক মহিলাকে চুমু (অবৈধভাবে) দেয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এর সমাধান চাইল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়, 'সালাত কায়িম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথম ভাগে। অবশ্যই নেক আমল পাপকে মুছে দেয়। নাসিহাহ গ্রহণকারীদের জন্য এটি একটি নাসিহাহ।' (সুরা হুদ, আয়াত : ১১৪)। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করল, এই নির্দেশ কি আমার জন্যই? জবাবে রাসুল

হুকুমের ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে।

ক. এক লোক হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামানকে এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করল, 'এই আয়াত কি বনু ইসরাইলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে?' তখন তিনি বললেন, 'কতই না চমৎকার তোমাদের ভাই বনু ইসরাইল! যদি মনে করো সব তিক্ততা বনু ইসরাইলের জন্য আর সব মিষ্টতা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহর শপথ, তোমরা জুতোর ফিতা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করবে।'[২৮৭] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা তাদের প্রতিটি আচার-আচরণ পর্যন্ত অনুসরণ করবে।' অর্থাৎ তিনি বিস্মিত হয়েছেন, যেসব মুসলিম এই আয়াতগুলো আহলুল কিতাবের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের মাথা থেকে এ কথা কীভাবে উধাও হয়ে যায় যে, আহলুল কিতাবের তাওরাত-ইনজিল নিষ্ক্রিয় করার কারণ একটাই—আল্লাহর শরিয়াহ প্রত্যাখ্যান করা। আর এটাই কুফর এবং তাঁর শরিয়াহর গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া! তাওরাত ধ্বংস করা এবং তাওরাতের বিধান অকার্যকর করে তোলার জন্য ইহুদিদের ঠিকই কাফির বলবে, পক্ষান্তরে যেই মুসলিম আল্লাহর শরিয়াহকে অকার্যকর করে রেখেছে তাকে কাফির বলবে না। এটা কখনোই ইনসাফ হতে পারে না।

তাই হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই শর্ত দিয়ে বলেছিলেন—যদি মনে করো সব তিক্ততা ইহুদিদের জন্য আর সব মিষ্টতা তোমাদের জন্য, তাহলে মনে করতে পারো, এই আয়াত বনু ইসরাইলের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ তাদের শরিয়াহ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা কাফির, আর তোমরা তোমাদের শরিয়াহ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও ইমানদার! এমনটা মনে করলে তা হবে অন্যায় বণ্টন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমার উম্মাতের যে ব্যক্তিই এ আমল করবে তার জন্য। (সহিহ বুখারি : ৪৬৮৭)। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'থালার পর থালা সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে। কিন্তু আল্লাহ সতর্ক করেছেন, "...পার্থিব জীবনে তোমরা যথেষ্ট আরাম-আয়েশ পেয়ে গেছ..." (সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২০)' (তাফসির কুরতুবি : ৮/১২)। এ আয়াত কাফিরদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হলেও তিনি তা মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করেছেন। এতেও প্রমাণ মেলে, কুরআনের আয়াতের হুকুম ব্যাপক। [নিরীক্ষক]

[২৮৭] তাফসির তাবারি : ৪/১৩; ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনি, তাফসির আবদুর রাযযাক : ২/২০, বর্ণনা নং : ৭১৪; সনদটি মুরসাল হলেও এর ভাষ্য সহিহ। কারণ, এর কাছাকাছি ভাষ্যে ইমাম হাকিমের বর্ণনা রয়েছে, যা সহিহ (আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস নং : ৩২১৮; ইমাম হাকিম বলেছেন, এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। ইমাম যাহাবিও এতে একমত পোষণ করেছেন)। [নিরীক্ষক]

খ. ইমাম শাবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়াতে বর্ণিত 'তারাই কাফির' কথাটি মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 'তারাই যালিম' কথাটি ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর 'তারাই ফাসিক' কথাটি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।[২৮৮]

ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়িদ, ইবনু যায়িদাহ, আবু শুবরামাহ এবং আবু বাকর ইবনুল আরাবি এ মতই গ্রহণ করেছেন।

গ. হাসান আল-বাসরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

نَزَلَتْ فِي الْيَهُوْدِ وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ

'এটি যদিও ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তবে আমাদের ওপরও আবশ্যক।'[২৮৯]

ঘ. ইবরাহিম আন-নাখয়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই আয়াত বনু ইসরাইলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তবে আল্লাহ এই উম্মাহর জন্যও তা পছন্দ করেছেন।'[২৯০]

ঙ. ইবনু মাসউদ ও হাসান আল-বাসরি বলেন, 'এই আয়াত সাধারণভাবে ওইসব ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করবে না—চাই সে মুসলিম হোক কিংবা ইহুদি বা অন্য কোনো কাফির হোক।'[২৯১]

চ. সুদ্দি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত বা জোর করে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দিয়ে শাসন করে না, সে কাফির। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এসব আয়াতকে আহলুল কিতাবের সাথে নির্দিষ্ট করা এবং এমনভাবে ব্যক্ত করা কোনো মুসলিমের অধিকার নেই, যেন আয়াতগুলো কোনোভাবেই মুসলিমদের

---

[২৮৮] তাফসির তাবারি : ১০/৩৫৪, বর্ণনা নং : ১২০৩৮, ১২০৩৯, ১২০৪১, ১২০৪২, ১২০৪৩, ১২০৪৪, ১২০৪৫; এই সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন সনদ। বর্ণনাটি সহিহ। [নিরীক্ষক]

[২৮৯] আহকামুল কুরআন : ৪/৯৩; তাফসির তাবারি : ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং : ১২০৬০; এর সনদের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। তবে সনদে হুশাইম নামক এক ব্যক্তি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হওয়া সত্ত্বেও তাদলিস এবং ইরসাল খাফি করতেন। কিন্তু মুহাদ্দিস কিরাম বলেছেন, তিনি যখন অন্য সিকাহ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তখন সেটি গ্রহণযোগ্য হয়। আর এই সনদে তিনি আওফ ইবনু আবি জামিলাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে মুহাদ্দিস কিরাম সিকাহ বলেছেন। তাই, সনদটি সহিহ সাব্যস্ত হওয়ায় কোনো বাধা নেই। [নিরীক্ষক]

[২৯০] তাফসির ইবনু কাসির : ৩/১১৯; তাফসির তাবারি : ১০/৩৫৭-৩৫৮, বর্ণনা নং : ১২০৫৭, ১২০৫৮, ১২০৫৯; এই সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন সনদ। বর্ণনাটি সহিহ। [নিরীক্ষক]

[২৯১] তাফসির কুরতুবি : ৬/১১০; ইমাম কুরতুবি সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। [নিরীক্ষক]

অন্তর্ভুক্ত করে না।'[১৯১]

এসব দলিল দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপনকারীদেরকে উসতায মাহমুদ শাকির তাফসিরে তাবারির একটি টীকায় খণ্ডন করেছেন। তিনি আবু মিজলাযের বর্ণনার ব্যাপারে বলেন,

> 'আমাদের সময়ের বিদআতিরা যেগুলো দিয়ে দলিল দেয়, বনু সাদুসের খারিজিদের প্রশ্ন সেগুলোর ব্যাপারে ছিল না। আমাদের জমানায় তো মানুষের ধন-সম্পদ, ভিটে-মাটি, আসবাবপত্র, জানমালের নিরাপত্তা মুসলিমদের দ্বীনি শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর খারিজিদের প্রশ্নগুলো আদতে মুসলিমদের জন্য নতুন কোনো কুফরি আইন প্রয়োগের বিষয়ে ছিল না।
>
> এই ধরনের কাজ আল্লাহর বিধানকে স্পষ্টভাবেই উপেক্ষা করা, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করা এবং কাফিরদের আইনকানুনকে আল্লাহর শরিয়াহর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া। এই কাজ কুফর। কোনো মুসলিম এতে সন্দেহ প্রকাশ করবে না। তবে উক্ত কাজের প্রবক্তাকে এবং এই কাজের প্রতি আহ্বানকারীকে তাকফির করার ব্যাপারে মুসলিমরা মতভেদ করেছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়টাতে আল্লাহর বিধানকে ব্যাপকহারে পরিত্যাগ করা হচ্ছে এবং অন্য বিধানকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে; অথচ ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। সমস্ত মুসলিম বিচারক, যাঁরা বিচার-ফায়সালা করেছেন, শরিয়াতকে বিচারব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য করেছেন। এটি হলো এক বিষয়। আরেকটি বিষয় হলো, কোনো বিচারক কোনো একটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ছেড়ে বিচার করেছেন। হয় সে এটা অজ্ঞতার কারণে করেছে, ফলে তার কাজটা শরিয়াহর বিধান না-জানার ওজর হবে; অথবা সে এটা করেছে প্রবৃত্তির তাড়নায়, ফলে এটা কবিরা গুনাহ হবে। এটা তাওবাহ ও ইসতিগফারের মাধ্যমে শোধরে যাবে। আবার এও হতে পারে, সে কুরআনের কোনো বিধানকে ব্যাখ্যাপূর্বক এমন করেছিল, যেটা তার যুগের উলামা কিরাম মেনে নেননি। তাহলে তার এই কাজটা ওইসব ব্যাখ্যার মতোই হবে, যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্‌গত ধারণা থেকে নেয়া হয়েছে। আর আবু মিজলাযের যুগ বা তার আগে-পরের যুগে এমন কোনো শাসক ছিল না, যে শাসক শরিয়াতের কোনো একটি হুকুমকে অস্বীকারপূর্বক নতুন কোনো হুকুম জারি করেছিলেন, অথবা শরিয়াতের কোনো হুকুমের ওপর

[১৯১] তাফসির তাবারি, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং : ১২০৬২; এর সনদ হাসান। [নিরীক্ষক]

কাফিরদের তৈরি করা হুকুমকে প্রাধান্য দিয়েছিল।'[১৯৩]

সারসংক্ষেপ

যারা এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক বিধিবিধানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে, নিঃসন্দেহে ওই মুহূর্তেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই এই নতুন বাতিল ধর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তি শাসক হোক বা আইনপ্রণয়নকারী, পরামর্শদাতা, বিচারক অথবা সাধারণ কোনো মানুষই হোক। এ ছাড়া যারা এসবে সন্তুষ্ট নয়, তবে এই মানবরচিত আইনের কাছে বিচার নিয়ে যায়, আমরা আশা রাখি আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে সঠিক বিষয়টি ঢেলে দেবেন। আমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থির হয়েছে যে, এই নতুন বাতিল মতবাদের ব্যাপারে মানুষ কয়েক প্রকারে বিভক্ত :

১. শাসক : যেসব শাসক আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তনের আদেশ দেয় এবং সে স্থানে কুফরি আইন প্রতিস্থাপন করে, সেসব শাসক এই কাজের মাধ্যমেই মুসলিম মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, সে আল্লাহর বিধানের ওপর মানুষের বানানো বিধানকে প্রাধান্য দিয়েছে। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহর আইনের চেয়ে মানুষের তৈরি আইনই সমাজের জন্য বেশি উত্তম। এসব জঘন্য লোকের ব্যাপারেই আল্লাহ ঘোষণা করছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তারা তোমার প্রতি এবং তোমার আগে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ইমান এনেছে। কিন্তু তারা তাগূতের কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাগূতকে অস্বীকার করতে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।'[১৯৪]

তাদের ইমান স্রেফ ধারণা ও মিথ্যা। তাদের ইমানের দাবি সত্য নয়। ইমানের হাকিকাত তো তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার (অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য সকল আইন) বিরোধী। বরং ইমানের হাকিকাত তো এটাই শেখায় যে, এসব

[১৯৩] উসতায মাহমুদ শাকির, তাখরিজ তাফসির তাবারি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৪৮-৩৮৯, বর্ণনা নং : ১২০২৫-১২০২৬।

[১৯৪] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬০

আইনকে অস্বীকার করতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

২. বিধানপ্রণেতা : যে বিধানপ্রণয়নকারী আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত বিধান তৈরি করে, সে মূলত নতুন একটা দ্বীন তৈরি করে। এর ফলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। যখন সে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ছেড়ে মানুষের জন্য নতুন কোনো বিধান তৈরি করে, সে নিজেকে সরাসরি আল্লাহর প্রভুত্বে শরিক করে,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ

'তাদের কি এমন শরিক আছে, যারা তাদের জন্য এমন বিধানপ্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[১১৫]

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

'তারা (ইহুদি-খ্রিষ্টান) তাদের যাজক ও পুরোহিতদের এবং মারইয়ামপুত্র মাসিহকেও আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।'[১১৬]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রুবুবিয়াতের কর্তৃত্ব দেয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তাদের ধর্মবেত্তারা হালাল বিধানকে হারাম করত এবং হারাম বিধানকে হালাল করে দিত।

আদি ইবনু হাতিমের হাদিসে এসেছে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন—আমরা তো আমাদের ধর্মগুরুদের ইবাদত করতাম না। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হাঁ, কিন্তু তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বলে ঘোষণা দেয়ার পর তোমরা কি সেগুলো মেনে নাওনি?'

তখন তিনি বললেন—হাঁ, নিয়েছিলাম। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটাই তো তাদের ইবাদত করা।[১১৭]

---

[১১৫] সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ২১

[১১৬] সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৩১

[১১৭] সুনানুত তিরমিযি : ৩০৯৫, ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করার পর একে গারিব (একক সূত্রে বর্ণিত) বলেছেন। অনেকে দাবি করেছেন, ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। অথচ সুনানুত তিরমিযির অনেক নুসখায় (সংস্করণ) হাসান শব্দটি উল্লেখ নেই। মোটকথা, এই বর্ণনা দুর্বল। তবে এর একটি শাহিদ (ভিন্ন সাহাবি থেকে সমার্থক বর্ণনা) রয়েছে, যা মাওকুফ (সাহাবির বক্তব্য) এবং সেটি ইমাম আবদুর রাযযাক তাঁর তাফসিরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—তাফসিরু আবদির

৩. আইনপ্রণয়ন পরিষদ—যারা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইনপ্রণয়ন করে। এমন আইন যারা তৈরি করবে, তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়বে। আইনসভার মুসলিম সদস্যের জন্য আল্লাহর বিধানের বিপরীত সামান্য কোনো বিষয়ে সমর্থন জায়িয নেই।[২৯৮]

৪. বিচারক : যারা আল্লাহর শরিয়াহ ব্যতীত অন্য আইন কার্যকর করে, তারা ইসলাম থেকে বের না হলেও তাদের এই কাজ, বেতনভাতা সবকিছুই হারাম ও বাতিল।[২৯৯] আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ, সে একটা হারাম কাজের দায়িত্ব পালন করছে।

রাযযাক : ২/১৪৪, হাদিস নং : ১০৭৩। উল্লেখ্য, এ বর্ণনাও মুরসাল। তবে সনদের বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। উভয় বর্ণনার সমন্বয়ে দুর্বলতা কিছুটা হালকা হয়ে হাদিসের মূল ভাষ্যটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এ জন্যই ইমাম আলবানি একে হাসান বলেছেন এবং এর সমার্থক আরও কিছু বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। (আলবানি, সিলসিলা সহিহাহ, হাদিস নং : ৩২৯৩) [নিরীক্ষক]

[২৯৮] শরিয়াহবিরোধী বিধানব্যবস্থার আইনসভায় অংশগ্রহণ আদৌ জায়িয নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা কুফর হয়ে থাকে। শাইখ আলি আল-খুদাইয়ের অভিমতের সারমর্ম হলো :

১. কেউ যদি আইনসভায় শরিয়াবিরোধী বিধানপ্রণয়ন করে বা তাতে সন্তুষ্ট থাকে, একে সমর্থন করে, তবে এটা কুফর।

২. মানবরচিত বিধানব্যবস্থা শরিয়াহবিরোধী জেনেও এটা মেনে চলার শপথ করে তাতে প্রবেশ করে, তবে তাও কুফর।

৩. উপর্যুক্ত দুটো কাজে লিপ্ত হয় না, বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে আইনসভায় যোগ দেয়, এসব অপকর্মের বিরোধিতা করে, তবে তার পদ্ধতিটা ভুল। (দেখুন : হুকমুল বারলামানাত ওয়াল বারলামানিয়িন) [ভাষা-সম্পাদক]

[২৯৯] এখানে একটি বিষয় ধর্তব্য। আইন হিসেবে যদি শরিয়াত বলবৎ থাকে এবং শরিয়াতই বিচার-ফায়সালার মাপকাঠি ও আইনের সর্বোচ্চ উৎসের মর্যাদায় আসীন থাকে, অর্থাৎ শরিয়াতি বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, তবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত নিজ প্রবৃত্তিবসে বিচার করলে ওই শরয়ি বিচারক কাফির হয়ে যায় না। তবে বিচারক যদি মানবরচিত আইন, সংবিধান বা ভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী বিচার করে, তবে এটা আর ছোট কুফর কিংবা হারাম থাকে না। শাইখ আলি আল-খুদাইর এক ফাতওয়ায় বলেন,

أما الحاكم والقاضي؛ إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة، وليس عن قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد؛ فهذا كفر دون كفر

'আর শাসক ও বিচারক যদি কোনো একটি বিশেষ ব্যাপারে প্রবৃত্তি ও খায়েশাতের তাড়নায় হুকুম দেয়—আর সেটি প্রতিষ্ঠিত আইন (মানবরচিত), আইনের প্রকল্প, বিশেষ আইনকে ব্যাপককরণ, রীতি, প্রথা কিংবা ঐতিহ্য হিসেবে না হয়—তবে তা কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর)।' (মা হুকমুল হাকিমি বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ, ওয়ামাল ওয়াজিবু তুজাহাহ?) [ভাষা-সম্পাদক]

সে ওই ব্যক্তির মতো, যে কোনো সুদি ব্যাংকে পরিচালকের দায়িত্ব আছে অথবা কোনো মদের বার কিংবা কোনো জুয়ার আসরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে। এরূপ শরিয়াতবিরোধী আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, এমন ব্যক্তি মিল্লাত (মুসলিম জাতিসত্তা) থেকে বের হয়ে যায়, চাই সে যে-ই হোক না কেন। সে

৫. আইনজীবী : যেসব আইনজীবী শরিয়াতবিরোধী কোর্টের বিচারকদের সামনে মোকাদ্দমা পেশ করে, তাদের ব্যাপারে সমকালীন উলামা কিরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের মতে ওকালতি পেশা কয়েকটি শর্তে বৈধ হবে :

ক. আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়ন থাকতে হবে। এই বিশ্বাস রাখতে হবে—আমি আমার মক্কেলের অধিকার নিয়ে লড়ছি।

খ. শরিয়াতবিরোধী আইনে কোনো মামলায় লড়া যাবে না। যেমন ব্যভিচার, চুরি, সুদ ও হত্যা।

গ. আইনজীবী যখন বুঝতে পারবে তার মক্কেল মিথ্যাবাদী, মামলা পরিচালনা থেকে তখনই বেরিয়ে যেতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, বর্তমানে ওকালতি পেশা হারাম। অবশেষে সে তো তাগূতের কাছেই বিচারিক কার্যক্রম উত্থাপন করে। আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে যারা বিচার করে, তাদের সম্মানপ্রদর্শন করে। আবার কখনো তো বিচার-শুনানিতে প্রচুর বাড়াবাড়ির অনুপ্রবেশ ঘটে। একসময় এর দিকে মন ঝুঁকেও যায়।

৬. মুসলিম জনসাধারণ : যারা তাগূতের কাছে মোকদ্দমা ন্যস্ত করে। যদি জনগণ এ ব্যাপারে অধিকার থাকে যে, তারা চাইলে ইসলামি আদালতে বিচার নিয়ে যেতে পারে, আবার চাইলে কুফরি আদালতেও বিচারের ভার ন্যস্ত করতে পারে—এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যে ধরনের বিচারব্যবস্থার কাছে মোকদ্দমা দায়ের করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। যেমন, হালাকু খাঁর সময়কালের জনগণ করেছিল। হালাকু খাঁ দুই প্রকারের বিচারক নিয়োগ দিয়েছিল। সব জায়গায় দুধরনের বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটা ছিল 'আল-ইয়াসা' বিচারালয়—তাতারদের রচিত। আরেকটি ছিল কুরআনি বিচারালয়। যেসব লোক সে সময়ে আল-ইয়াসার কাছে নিজেদের মোকদ্দমা ন্যস্ত করেছিল, তারা সবাই কাফির হিসেবে গণ্য হবে, মুসলিম মিল্লাত

[৩৩৩] শাইখ আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নিঃসন্দেহে এই নব্য তাতার শাসনব্যবস্থার অধীনে বিচারক হওয়া একেবারেই বাতিল। এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া কোনোক্রমেই বৈধ নয়, সহিহ নয়।' (উমদাতুত তাফসির, ৪/৪৭১) [লেখক]

থেকে বেরিয়ে যাবে। ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তাহলে ওই ব্যক্তি কেন কাফির হবে না, যে আল-ইয়াসার কাছে ফায়সালার ভার ন্যস্ত করে এবং শরিয়াহর ওপর একে প্রাধান্য দেয়? মুসলিমদের ঐকমত্যে সে কাফির।'[৩০১]

কিন্তু বর্তমান সময়ে তাগূতি আইন মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্বে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। মানুষ নিজেদের অধিকার আদায়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাগূতি বিচারব্যবস্থার কাছে ন্যস্ত করছে বিচারিক ভার। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ একান্ত অপারগ বলে গণ্য হবে। এঁদের অপারগতার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। উত্তম হচ্ছে মুসলিমরা তাদের হক আদায় করা থেকে বিরত থাকবে, যেন তাগূত ও কাফিরগোষ্ঠীর কাছে কোনো বিচারের ভার ন্যস্ত করতে না হয়। সাইয়িদ মাওদুদি[৩০২] ও উসতায হাসানুল বান্নার ঝোঁকও এ দিকেই ছিল। তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন। তাঁর শরিয়াহর ছায়ায় সব ক্লান্তি দূর করার তাওফিক দিন।

শেষ কথা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর একটি চমৎকার বক্তব্য দিয়ে আমরা এ আলোচনার সমাপ্তি টানবো। যারা নিজেদের বিচার-ফায়সালার ভার বেদুইনদের রসম-রেওয়াজ, গোত্রীয় প্রথা ও তাগূতের বিচারব্যবস্থার প্রতি ন্যস্ত করে, তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'আল্লাহ তাঁর নবির ওপর যে বিধান নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা যে ব্যক্তি আবশ্যক মনে করবে না, অবশ্যই সে কাফির। পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠী ও মতবাদ সবাই কিছু না কিছু ন্যায়-ইনসাফ ও কল্যাণের কথা বলে। তাদের ধর্মে ন্যায়-ইনসাফ সেটাই হয়, যেটা তাদের ধর্মগুরুরা মনে করে। অসংখ্য লোক রয়েছে, যারা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত

---

[৩০১] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ১৩/১৩৯

[৩০২] শাইখ সাইয়িদ আবুল আলা মাওদুদি [২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩—২২ সেপ্টেম্বের, ১৯৭৯] : আলিম, চিন্তক, সাহিত্যিক, দায়ি ও সংগঠক। ১৯৭৯ সালে সাইয়িদ আবুল আলা মাওদুদি কিং ফায়সাল পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের অন্যতম সদস্য। নন্দিতের পাশাপাশি তিনি নিন্দিতও ছিলেন। কিছু লেখনীর কারণে বেশ সমালোচিত হন তিনি। সমালোচনায় অতিরঞ্জনের শিকারও হয়েছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে নিজেও বিচ্যুতির শিকার হন। [ভাষা-সম্পাদক]

করে ঠিকই, কিন্তু বিচার-ফায়সালা করে নিজেদের স্বভাব-প্রথা অনুযায়ী, যেভাবে আল্লাহ শাসনের অনুমতি দেননি। যেমন, বেদুইনদের প্রচলিত উপাখ্যান, যা দিয়ে তারা শাসন কাজ চালাত। তারা বিশ্বাস করত, কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া যা ইচ্ছে তা দিয়ে শাসনকাজ চালানো যায়। এটাই কুফর। বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারা নিজেদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রাচীন রীতি-রেওয়াজ দিয়েই শাসনকাজ পরিচালনা করত। তারা যদি এ কথা বোঝার পরও আল্লাহর নীতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়েই শাসন করাকে হালাল মনে করে, তবে অবশ্যই তারা কাফির।'[৩০৩]

চমৎকার হবে যদি আমরা এমন এক ব্যক্তির অভিব্যক্তি দিয়ে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি, যিনি এসব মানবরচিত আইনব্যবস্থা খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং সেই পরিবেশেই বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি হলেন শহিদ আবদুল কাদির আল-আওদাহ (রাহিমাহুল্লাহ)।[৩০৪] তিনি বলেন,

'কোনো মুসলিম কখনোই আল্লাহর কাছে মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের সব পরিস্থিতিতে ইসলামকেই ফায়সালাদানকারী নির্বাচন করবে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ইসলামকেই সমাধানের মাপকাঠি নির্ধারণ করবে। যেন সে আল্লাহর এই বাণীকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে, সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"[৩০৫]

যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, বরং

---

[৩০৩] মিনহাজুস সুন্নাহ : ৫/১৩০

[৩০৪] শাইখ আবদুল কাদির আওদাহ [১৯০৬—১৯৫৪] : মিশরীয় লেখক ও বিচারক। বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমে যোগদান করেন। যালিম শাসক থেকে নানা ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা (শহিদ) করা হয়। [ভাষা-সম্পাদক]

[৩০৫] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

শরিয়াহবিরোধী শাসনব্যবস্থার কাছে বিচারের দ্বারস্থ হবে, সে কাফির। তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ইসলাম নেই, যদিও তাকে মুসলিম নামে ডাকা হয় এবং বংশগতভাবে মুসলিম বাবা-মায়ের পরিচয়ে বড় হয়। এমনকি নিজের ব্যাপারে ইসলামের দাবি করলেও সে কাফির। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।"[৩০৬]

এই ইসলামি শাসনবিধানকে প্রতিনিয়তই নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ, শাসনরীতি একে অপসারণ করে চলেছে। জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারবে, ইসলামের সাথে ওইসব মতবাদের সম্পর্ক কতটুকু। আর কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলতে পারবে, এসব আইনব্যবস্থা মুসলিমদের প্রতিনিয়ত কুফরের দিকে প্ররোচিত করছে। সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'[৩০৭]

[৩০৬] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৪

[৩০৭] আল-ইসলাম ওয়া আওদাযুনাল কানুনিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৭

অষ্টম অধ্যায়

আকিদাহর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি : পরিণাম-পরিণতি

করুণ পরিণতি

কোন সুদৃঢ় বিশ্বাস না-মেনে দ্বীনের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে চেয়ে মানবজাতি কোন কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তারা চরিত্র, দ্বীন, চিন্তা এবং সব রেওয়াজ-প্রথার সংস্কারের ডাক দিয়েছিল। আজ এর করুণ পরিণতি তো দেখতেই পাচ্ছে। যেসব দেশ বস্তুগত দিক দিয়ে সম্পদের প্রাচুর্যে ভাসছে, তাদের দিকেই লক্ষ করুন :

১. যার নমুনা, একদিকে তাদের অর্থনীতি আকাশচুম্বী ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে সম্পদ বণ্টনে অবিচারের ফলে দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব। একদিকে বিলাসিতা, অন্যদিকে দরিদ্রদের ভেতরে প্রতিহিংসার ক্রোধ। তাদের সমাজব্যবস্থা ধাপে ধাপে ভেঙে পড়ছে। সমাজব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

২. দমন, খুন ও ভীতির পরিস্থিতি এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, যাদের নেতৃবর্গ বণ্টনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলত। তাদের পথঘাটগুলো পরিণত হয়েছিল কসাইখানায়। রক্তবন্যায় তাদের রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে উঠেছিল। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময়ের মাঝে ছাব্বিশ মিলিয়ন মানুষ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। যার বাৎসরিক গড় ছিল এক মিলিয়নের কিছু বেশি। যুগোশ্লোভিয়ায় এক মিলিয়ন মুসলিম কমে যায়।

৩. ক্রমাগত আত্মিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় তাদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনকে প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত করেছে। যেকোনো সভ্যতা টিকে থাকার জন্য এমন কিছু সামাজিক নিরাপত্তা আবশ্যক, যা তাকে রক্ষা করবে। এমন শক্তি থাকা চাই, যা তাকে বাঁচাবে। যখন কোনো জনগোষ্ঠী যৌনতার কর্দমে নিমগ্ন হয় এবং জন্তু-জানোয়ারের শামখেয়ালিপনায় লিপ্ত হয়, তখন সেই সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ইতিহাসই এর উত্তম সাক্ষী। এথেন্স যখন থেকে প্রবৃত্তির পূজা-অর্চনা শুরু করেছিল, পৃথিবীর মানচিত্রে মুছে গিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যও ধসে পড়েছিল অথচ এই বিশাল দাপুটে

সাম্রাজ্য নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল হাজার বছর। এর ভেতর প্রাণ সঞ্চার করতে সময় লেগেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। কিন্তু ভ্যান্ডাল (Vandal) ও এলান্সের (Alans) কয়েকটি বর্বর সম্প্রদায়ের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে রোমানরা মুখ থুবড়ে পড়ে, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।[৩০৮] আর এমনটা ঘটেছিল যখন রোমানরা ভেনাসের (রোমান পুরাণের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী) মতো একজন ব্যভিচারিণীকে সৌন্দর্যের দেবী বানায়। বাখুসের মতো উন্মাদ মাতালকে মদের দেবতা বলে মেনে নেয়। আরেক রোমান দেবতা কিউপিডের (রোমান পুরাণের কামদেবতা) ব্যাপারে গ্রিকপুরাণে অনেক মিথগল্প ছড়ানো আছে। সে ছিল গ্রিকদেবী আফ্রোদিতির সন্তান। আফ্রোদিতি ছিল গ্রিকদের প্রেম ও ভালোবাসার দেবী, যে কিনা তিন-তিনজন দেবতার সাথে যৌনক্রিয়ায় মেতে উঠেছিল। তাই, কিউপিডও তার মায়ের মতো প্রেমদেবতার স্থান পায়।

৪. স্নায়ুবিক অস্থিরতা, মানসিক বিক্ষিপ্ততা, আত্মিক ও দৈহিক ব্যাধি এবং সংক্রামক ঘা-জখম, সমকামিতা, মানসিক বিচ্ছিন্নতা, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা পর্যন্ত সেই বিলাসবহুল সমাজে ভয়াবহ আকারে বিস্তারলাভ করেছিল। বিশেষ করে অভিনয়, সিনেমা ও নাটকে এমন বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়। যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ, যেমন গনোরিয়া ও সিফিলিসের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব এক আমেরিকায় কী পরিমাণ হয়েছিল তার একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান দেখুন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার তথ্যমতে যৌনবাহী রোগের উপসর্গ সব রোগের চেয়ে বেশি চিহ্নিত করা গিয়েছে। এর একটি পরিসংখ্যান দেখে তা বুঝবেন। আজ ৯০% আমেরিকান যুবক গনোরিয়ার রোগে আক্রান্ত। ৬০%-এর মতো যুবক সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। ৪০%-এর মতো যুবক যৌন অক্ষমতার শিকার। বছরে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশহাজার শিশু বংশানুক্রমিক গনোরিয়ার মতো যৌনবাহিত রোগে মারা যায়।[৩০৯], [৩১০] এর

---

[৩০৮] ভ্যান্ডালরা মূলত জার্মানিক। এলান্স উত্তর ককেশীয় ও মধ্যযুগীয় ইরানি যাযাবর গোষ্ঠী। একসময় এলান্স ও ভ্যান্ডালরা মিলে উত্তর আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য (৪২৯-৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) গড়ে তুলেছিল। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) [ভাষা-সম্পাদক]

[৩০৯] দেখুন, সাইয়িদ আবুল আলা মাওদুদির কিতাব 'কিতাবুল হিজাব'। [লেখক]

[৩১০] আমেরিকায় প্রতি বছর ক্ল্যামেডিয়া, গনোরিয়া ও সিফিলিস, এই তিনটি যৌনবাহিত রোগ আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। গনোরিয়ার ভয়াবহ রূপের কারণে একে আমেরিকার দ্বিতীয় নোটিফাইয়েবল ডিজিজ (যে রোগ দেখা দিলে আইনত সরকারকে জানাতে হয়) ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার মানুষ এগুলোতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। ২০২১ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকাতে গনোরিয়ার হার ২০০৯ সালের সর্বনিম্ন সংখ্যা থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ১১৮%-এ এসে দাঁড়িয়েছে, যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অন্যদিকে

কারণে দেখা যায়, যুবকদের বিরাট এক অংশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার মতো যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রোগের কারণে এক ফ্রান্সই সত্তরহাজার যুবককে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে আমেরিকার ছয় মিলিয়নের মাঝে এক মিলিয়ন লোকই সামরিক বাহিনীর অনুপযোগী।[৩১১] এই রোগের কারণে মেধা নষ্ট হতে থাকে, ধৈর্যক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি সন্তানপ্রজননও হ্রাস পায়।

৫. ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ব্যাপক ভয় এই অস্থির বিশ্বকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। ভয়াবহ যুদ্ধের অপচ্ছায়া পৃথিবীর তাবৎ মানুষের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে ঘুম।

৬. কিছু জনগোষ্ঠী ধ্বংসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যেমন ধরুন, এক ফ্রান্সেই ৪২ মিলিয়ন অধিবাসীর ৩৩ মিলিয়নই নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।[৩১২]

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা

চলুন, শহিদ সাইয়িদ কুতুবের কিছু অভিব্যক্তি তুলে ধরি। সাইয়িদের খুব চমৎকার একটি আলোচনা। তিনি বলেন,

> ‘কোনো সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তি—যাকে এখনো ওইসব কলুষতা স্পর্শ করতে পারেনি, যা আজকের মানুষের মধ্যে জেঁকে বসেছে—যখন সে এই দুর্ভাগা মানুষের চিন্তা-চেতনা, রীতিনীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, অনুসরণ, স্বভাব-চরিত্র ও চলাফেরার দিকে লক্ষ করবে, সে দেখতে পাবে এই প্রতিটা বিষয় ব্যাপক নোংরা হয়ে পড়েছে। সে দেখতে পাবে, এই বিশ্বব্যবস্থা নির্বোধের

প্রতি বছরের মতোই ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের মাঝে সিফিলিসের হার প্রায় ২৮.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা প্রায় ৪৬.৫ জন পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত। নারীদের মাঝে তুলনামূলক কম হলেও ২০১৭-২০২১ সাল নাগাদ ৫৫.৩% থেকে তা ২১৭.৪%-এ এসে পৌঁছেছে। (সূত্র : জন হপকিন্স গাইডস এবং সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, আমেরিকা) (সংগৃহীত) [ভাষা-সম্পাদক]

[৩১১] ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিল, ‘আমেরিকান তরুণরা আজ আর সৈনিক হবার উপযুক্ত নয়, তারা তো পুরোপুরি যৌন-উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।’ [লেখক]

[৩১২] ২০২০ সালে ফ্রান্সে জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৮.৬৪ মিলিয়ন। *Abbé Pierre Foundation (FAP)*-এর হিসাব ও অনুমানে ফ্রান্সে ৩ লক্ষ ০০ হাজার মানুষ গৃহহীন। [ভাষা-সম্পাদক]

মতো নিজের দেহাবরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ কীভাবে ছুড়ে ফেলেছে। কতটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে এই বিশ্বসভ্যতার কর্মতৎপরতা, পাগলের মতো কতটা দিশেহারা হয়ে গেছে, সে বুঝতে পারবে। পরিধেয় পোশাক ও ঘরের সাজসজ্জার মতো চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে কতটা পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। সে একে দেখতে পাবে ব্যথায় চিৎকার করে উঠছে। ধাওয়া খাওয়া ব্যক্তির মতো চলছে। হাসছে পাগলের মতো। মাতালের মতো কলহ বাধায়। অনর্থক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করছে। উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যর দিকে ছুটে বেড়ায়। নিজেদের মূল্যবান উপাদান ছুড়ে ফেলে হাতে লেপ্টে থাকা ময়লা পাথরের মতো নোংরা বস্তু সঞ্চয়ে মেতে উঠেছে। অভিশাপ এদের ওপর। ওইসব ব্যক্তিদের মতো অভিশাপ, যারা পৃথিবীর অলীক কল্পকথা বলে বেড়ায়। এ তো মানুষকে মেরে ফেলছে। উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে তাকে যন্ত্রে রূপান্তর করছে। মনুষ্যত্বের উপাদানগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে এসব বিষয়। তাদের চরিত্র, সৌন্দর্য ও উন্নত মননের যে অনুভূতি, ধ্বংস করে দিচ্ছে তাও। এ সবকিছুই করা হয়েছে গুটি কয়েক সুদখোর পুঁজিপতি, পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রবৃত্তিপূজারী ব্যবসায়ী, সিনেমা ও ফ্যাশন পরিচালকদের লাভের জন্য। আপনারা মানুষগুলোর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পোশাক, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, চিন্তা-চেতনা, অভিমত ও আহ্বানগুলো ভালো করে খেয়াল করুন। আপনার কাছে মনে হবে তারা সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিতাড়িত হচ্ছে। কোনো কিছুর ওপরই স্থির থাকতে পারছে না। কোনো কিছুই মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। তারা বাস্তবেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা অস্থির। অন্তরাত্মা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ভেতরটা কোনো জায়গাতেই প্রশান্তি পাচ্ছে না। আত্মা কোনো মজবুত অক্ষ-বৃত্ত ঘিরে আবর্তন করতে পারছে না।

আর এই অসহায় দুর্ভাগা মানবসভ্যতাকে ঘিরেই গজিয়ে উঠেছে একদল সুবিধাভোগী। তারা মানুষের এই হতভম্ব নির্বুদ্ধিতা লুফে নিয়েছে। অন্যদিকে কিছু অবাধ্য ঘাতকদলের উত্থান হয়েছে। এরা হলো সুদি বিনিয়োগকারী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ফ্যাশনশো উদ্যোক্তা, সাংবাদিক ও লেখকের দল। বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধিতে এরা উল্লাস করছে। বিশ্বসভ্যতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিশ্চল হয়ে পড়েছে তার স্বাভাবিকতা ও উচ্ছল কর্মতৎপরতা। অবশেষে যখন সব জটিলতা কাটিয়ে নীড়ে ফিরে আসার সংগ্রাম করছে, তখন এই বিকারগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী নিয়ন্ত্রক মহল এই মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে নতুন নতুন বিপর্যয় আর

দুর্যোগের কলকাঠি নাড়ছে। আরেক গোষ্ঠী আছে, যারা কোনো সামঞ্জস্য ও নিয়মনীতি ছাড়াই সবসময় উন্নতি, অগ্রগতি ও সংস্কারের ডাক দিতে থাকে। এ সবগুলোই পুরো মানবজাতির জন্য, এই দুর্ভাগা জাতির জন্য বিপজ্জনক।'[৩১৩]

বিপরীতমুখী দৃশ্য

শুনুন, এবার আপনাদের একটি বিপরীতমুখী দৃশ্য দেখাই। আকিদাহ যে মুসলিম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, আপনি তাকে দেখতে পাবেন কতটা প্রশান্ত মনের অধিকারী, শান্ত মনের ও পরিতৃপ্ত! তার মাঝে কোনো অস্থিরতা ও পেরেশানির চিহ্ন নেই। এমনকি তাদের একেকজনের অভিব্যক্তি হয় এমন—আমরা যে সৌভাগ্যে আছি, যদি রাজা-বাদশাহরা বুঝত, তাহলে এই আত্মপ্রশান্তি ছিনিয়ে নিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো![৩১৪]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাদশাহ কাদের বলা হয়?' তিনি বললেন—দুনিয়াবিরাগী মানুষগুলোই বাদশাহ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইতর লোক কারা?' তিনি বললেন—যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।[৩১৫] তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইতরের চেয়ে আরও নীচ স্তরের কারা?' তিনি বললেন—যারা অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজেদের আখিরাত বরবাদ করে।

সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চমৎকার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

«عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ
أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

'মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়ের। তার প্রতিটি বিষয় কল্যাণকর। এই কল্যাণ মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। সে ভালো কিছু পেলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আর খারাপ কিছু পেলে সবর করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর

---

[৩১৩] খাসায়িসুত তাসাওয়ুরিল ইসলামি ওয়া মুকাওয়িমাতুহু, পৃষ্ঠা : ৯১

[৩১৪] ইবরাহিম বিন আদহাম বলেন, 'আমরা যে আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, তা যদি রাজা ও রাজপুত্ররা জানত, তাহলে তারা আমাদের উপভোগ্য জীবন ও কম কষ্ট-ক্লেশের কারণে তরবারি দিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।' (আবু নুয়াইম আসফাহানি, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৩৭০) [নিরীক্ষক]

[৩১৫] ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৩৯; ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/৩৯৯; বই দুটোতে এতটুকুই উল্লেখ রয়েছে। [নিরীক্ষক]

হয়ে যায়।'[৩১৬]

হৃদয়ে গাঁথা আকিদাহ

যার হৃদয়ে আকিদাহ গেঁথে গেছে, সে দুনিয়ার কোনো কিছুতে ভীত হয় না। কারণ :

১. দুনিয়ার কোনো প্রতিকূলতা কোনো মুসলিমকে দিশেহারা করে তুলতে পারে না। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এই মহাজগৎ তাঁরই তুচ্ছ সৃষ্টি। আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা।[৩১৭] সে ভালো করেই জানে মানুষ একমুঠো মাটি, ফুঁকে দেয়া একটি রুহ মাত্র। বিশ্বজগতের রব তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তার অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল জান্নাত থেকে। চলতে চলতে সে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। আর এমন সুদৃঢ় এক পথ আছে, যা তাকে পৌঁছে দেবে প্রথম ঘরে (জান্নাত)। এই তো সিরাতুল মুসতাকিম (সরল-সঠিক পথ)। কুরআন-সুন্নাহর একান্ত অনুসরণই এর সারকথা। জান্নাতের পথ থেকে বের করে দেয়ার জন্য পথরুদ্ধকারী শত্রুও বসে আছে। দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা যেসব প্রশ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল, তার সবই মহান রব মুমিন মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ মুসলিমদের এমন সত্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস পাঠিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন, যেখানে তার সব প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দেয়া আছে।

২. মুসলিম জানে এই দুনিয়াই শেষ নয়। আর কর্মের সব ফলাফলও এই দুনিয়াতে দেয়া হয় না। রবের কাছেই সব কিছুর গন্তব্য।

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

'মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। এরপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।'[৩১৮]

একজন মুসলিমের বিশ্বাস, দুনিয়াতে সে যা হারিয়েছে বা যা সঞ্চয় করতে পারেনি, আখিরাতে এর বদলা সে পাবে। আখিরাতের প্রশস্ত জীবনের তুলনায় দুনিয়ার ছোট্ট হায়াত যেন দিনের সামান্য সময়ের মতো।

---

[৩১৬] সহিহ মুসলিম : ৭৬৯২

[৩১৭] সুরা রাদ, ১৩ : ১৬; সুরা আয-যুমার, ৩৯ : ৬২

[৩১৮] সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩৯-৪১

فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل

'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ তো খুবই সামান্য।'[৩১৯]

এভাবেই এই বিশ্বাস তার হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরপুর করে দেয়। হৃদয়ের গভীরে সৌভাগ্যের অনুভূতি সঞ্চার করে। এই বিশুদ্ধ চিন্তাবিশ্বাসই একজন মুসলিমকে অনর্থক কথা-বার্তা, গুরুত্বহীন কাজ ও ছোটখাটো সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলতে শেখায়। সে গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি যত্নবান হয়। আরও আত্মত্যাগ ও জানমালের কুরবানি বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে জান্নাতের প্রত্যাশায় আল্লাহর পথে শেষ পর্যন্ত নিজ আত্মাটাও বিলিয়ে দেয়।

আপনারা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক রোমসম্রাটের কাছে পাঠানো চিঠির কথা স্মরণ করুন। তিনি রোমসম্রাটের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন—আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমন এক জাতি নিয়ে এসেছি, যাঁরা মৃত্যুকে এতটাই ভালোবাসে, তোমরা জীবনকে যতটা ভালোবাসো।[৩২০]

ইসলামের এই মহান তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ) বনু আবদিদ দারের এক নারীকে এ কথা বলার মতো শক্তি সঞ্চালন করেছিল যে, যখন তাঁকে তাঁর স্বামী, ভাই ও বাবার শহিদ হবার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমার নবির কী খবর?' লোকেরা বলল, 'তিনি সুস্থ আছেন।' তখন তিনি বললেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামযদিসুস্থথাকেন,তবেতোএসবদুঃসংবাদএকেবারেইতুচ্ছ।'[৩২১]

এই আকিদাহই সমকালীন ইসলামি লেখক সাইয়িদ কুতুবের বোন আমিনাহ কুতুবের মতো নারীকে মহিয়সী করে গড়ে তুলেছিল। বড় বড় আমির তাঁকে বিয়ের

---

[৩১৯] সুরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৩৮

[৩২০] তারিখু ইবনি খালদুন : ১১/৮১

[৩২১] ইমাম বাইহাকি, দালায়িলুন নবুওয়াহ, বর্ণনা নং : ১১৯৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ১৭/১৪৬; হাদিসটি মুরসাল, তবে এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। সনদে উল্লেখিত ইসমাইল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি সাদ ইবনি আবি ওয়াক্কাস ঘটনাটি সরাসরি বর্ণনা করেছেন। অথচ ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না। কারণ, তিনি প্রায় ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে এর আরেকটা সনদ আছে, যা ইমাম তাবারানি 'আল-মুজামুল আওসাত (হাদিস নং : ৭৪৯১)'-এ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতেও দুজন রাবির সমস্যা আছে। একজন মুহাম্মাদ ইবনু শুয়াইব আত-তাজিব। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মন্তব্য হলো, তিনি রাযিদের (রাযি নামক কয়েকজন রাবি) থেকে অপরিচিত ও অদ্ভুত হাদিস বর্ণনা করতেন। আরেকজন হলেন তাঁর উসতাদ আবদুর রাহমান ইবনু সালামাহ আর-রাযি। তিনি মাজহুলুল হাল (অবস্থা অজ্ঞাত)। মোটকথা, বর্ণনাটি মূলসনদেই সাব্যস্ত হয়। [নিরীক্ষক]

প্রস্তাব পাঠিয়েছে, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দেন। রাষ্ট্রদূতও বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে ১৯৬৩ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামীকে (কামাল আস-সানানিরি) বিয়ের পয়গাম পাঠান। কিন্তু এর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় দশ-দশটি বছর। আমার জানামতে এটিই ছিল ইতিহাসের দীর্ঘতম খিতবাহ (বিয়ের প্রস্তাব)। ১৯৭৩ সালে তিনি কারাকক্ষের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসলে আমিনাহ কুতুব তাঁকে বিয়ে করেন।

৩. মুসলিম সবসময় নিশ্চিন্ত। সে বিশ্বাস করে রিযক নির্ধারিত এবং মৃত্যুও ঠিক সময়েই আসে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ মরতে পারে না, এর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।[৩২২]

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু।'[৩২৩]

একজন মুসলিমের এই বিশ্বাস থাকে যে, এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুই নির্ধারিত। প্রতিটি ঘটনার পেছনে আল্লাহর শক্তি কাজ করে। প্রতিটি বস্তুর ওপর তাঁরই কর্তৃত্ব কার্যকর হয়। তিনি যা চান, তা-ই করেন।[৩২৪] তিনি নিজ বিষয়ে অপ্রতিরোধ্য।[৩২৫] তাঁর বিধান পেছনে ছুড়ে ফেলার অধিকার কারও নেই।[৩২৬] সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।[৩২৭] আসমান-জমিনের সব খাজানা তাঁরই অধীনে।[৩২৮] তিনি যাকে চান সম্মান দেন, যাকে চান লাঞ্ছিত করেন।[৩২৯] এই দৃঢ় আকিদাহ পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানিত করে তোলে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

---

[৩২২] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৫

[৩২৩] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ২২

[৩২৪] সূরা হুদ, ১১ : ১০৭, সূরা আল-বুরুজ, ৮৫ : ১৬

[৩২৫] সূরা ইউসুফ, ১২ : ২১

[৩২৬] সূরা আর-রাদ, ১৩ : ৪১

[৩২৭] সূরা হুদ, ১১ : ১২৩

[৩২৮] সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৭

[৩২৯] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ২৬

'যে সম্মান চায় তার জানা উচিত আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান।'[৩০০]

আকিদাহর ছায়াতলে

এই আকিদাহই ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর[৩০১] মতো মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। তিনি সেই যুগের শাসকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে দুর্গের বন্দিশালায় বেঁধে রেখেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন,

> 'তোমরা আমাকে কতটুকুই বা দমিয়ে রাখবে? যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তবে তো আমি শহীদ হবো। যদি জেলে আটকে রাখো, এ হবে আমার রবের সাথে নির্জনে সময় কাটানোর সুযোগ। আর যদি দেশান্তর করো, তা হবে আমার হিজরত।'[৩০২]

প্রতিটি যুগে প্রতিটি শতাব্দীতে এই আকিদাহর ছায়ায় অসংখ্য মহৎ ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। চলুন, আমরা কালের পর্দা উঠিয়ে দূরত্ব ডিঙিয়ে ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের[৩০৩] বজ্রকণ্ঠ শুনে নিই। সৎ শাসক ইসমাইলের পত্রবাহক এসে ইযযুদ্দিন ইবনু আবদিস সালামের কাছে এই প্রস্তাব করল—আপনি নিজ ভুলের জন্য বাদশাহর কাছে ওজরখাহি করবেন এবং খোশদিলে বাদশাহর হাতে চুমু খাবেন, যেন বাদশাহ আপনাকে কাযির পদে পুনর্বহাল করেন। তিনি বললেন,

> 'আল্লাহর কসম করে বলছি, স্বয়ং বাদশাহও যদি এসে আমার হাতে চুমু খায়, তবুও আমি তার হাতে চুমু খাব না। হে মানুষ, তোমরা থাকো এক

---

[৩০০] সুরা ফাতির, ৩৫ : ১০

[৩০১] তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদিল হালিম ইবনি আবদিস সালাম আন-নুমাইরি আল-হাররানি [২২ জানুয়ারি, ১২৬৩—২৬ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮] : একজন ইমাম, মুজতাহিদ ফকিহ, হাফিযুল হাদিস, মুজাহিদ, যাহিদ। ইতিহাসে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ নামেই পরিচিত। ইসলামি জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর পদচারণা নেই। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পতাকাবাহী। সালাফযুগে ফিরে যাবার বলিষ্ঠ দাওয়াতের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রই তাঁকে মহান করে তুলেছিল। অল্প কথায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। তাঁর জীবনী বিস্তারিত জানতে শাইখ আবুল হাসান আলি নাদবির লিখিত বইয়ের বাংলানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (খণ্ড : ২)' দেখুন। [ভাষা-সম্পাদক]

[৩০২] আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, পৃষ্ঠা : ৫৭

[৩০৩] ইযযুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম [৫৭৭ হিজরি—৬৬০ হিজরি] : শাফিয়ি ফকিহ। তিনি সুলতানুল উলামা বলে পরিচিত। শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণে ছিলেন অকুতোভয়। [ভাষা-সম্পাদক]

> উপত্যকায় আর আমরা থাকি আরেক উপত্যকায়। প্রশংসা সুমহান আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন বিষয় থেকে মুক্ত করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করছেন।'[৩০৪]

বর্তমান সময়ে অন্যতম মহৎ ব্যক্তি ছিলেন উসতায সাইয়িদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ)। কারাগারের অভ্যন্তরে তাঁকে বহু পদ-পদবির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, অনেক ধন-সম্পদের লোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি কারাবন্দিত্বই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই চকচকে কপট পদ আর প্রাচুর্য তিনি গ্রহণ করেননি, প্রবেশ করেননি এই মিথ্যা মরীচিকার জগতে। তিনি বলতেন,

> 'যে আঙুল সালাতে আল্লাহর তাওহিদের সাক্ষ্য দেয়, তা দিয়ে তাগূতের পক্ষে যায় এমন একটা বর্ণও আমি লিখতে পারব না।'

তিনি আরও বলতেন,

> 'কেন আমি করুণা চাইব, কেন আমি দয়া ভিক্ষা করব? আমি যদি হকের পক্ষে থেকে অপরাধী হই, তবে এই অপরাধ আমি মাথা পেতে নেব। আর বাতিলের পক্ষে থেকে অপরাধী হলে আমি আরেক বাতিলের কাছে করুণাভিক্ষা চাওয়া থেকে বহু ঊর্ধ্বে।'[৩০৫]

এই মহান আকিদাহই সুদানের মন্ত্রী মুহাম্মাদ সালিহ উমারকে এ দুনিয়া দুপায়ে মাড়িয়ে যাযাবর আর তাঁবুর দুনিয়া বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ফিলিস্তিনের টিলায়, পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় মুজাহিদবেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে 'আবা' উপত্যকায় শহিদবেশে মহান রবের কাছে ফিরে যান।

---

[৩০৪] সুয়ুতি, হুসনুল মুহাদারা : ১/৪৭৬

[৩০৫] বাসসাম, উলামা ওয়া উমারা, পৃষ্ঠা : ৯৬

নবম অধ্যায়

কীর্তিমানের কীর্তিগাঁথা

জীবনচিত্র

এখন আমরা ওই সকল কীর্তিমানের কথা আলোচনা করব, বিশুদ্ধ আকিদাহই যাঁদের বিনির্মাণ করেছিল। ইসলামের এই মহান আকিদাহ এমন কিছু দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, যা শুনলে মানুষ মনে করবে এগুলো বুঝি কাল্পনিক বিষয়। অথচ এগুলো এমনই বাস্তবতা, কল্পনারও ঊর্ধ্বে। তাঁরা সত্যের পথে জীবন কাটিয়েছিলেন, সত্যকে আঁকড়ে ধরেই জিন্দেগি পার করেছিলেন। যত বড় কুরবানির প্রয়োজন পড়ুক না কেন, তাঁরা সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চলুন, তাঁদের জীবনের কিছু দৃশ্য তুলে ধরি।

▪ এক

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ) উচ্চস্তরের তাবিয়ি ছিলেন। তিনি মনে করতেন খলিফাহ থাকাকালীন অন্য কারও জন্য বাইয়াত দেয়া বৈধ নয়। তাঁর এ মতটি ছিল হাদিস অনুযায়ী এবং হাদিসের বুঝটি তাঁর কাছে বিশুদ্ধ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটিই হাদিসের উদ্দেশ্য। এ জন্য শাসক তাঁকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করেছিল। তবুও তিনি আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সময় পর্যন্ত নিজের মতের ওপর অটল ছিলেন। আবদুল মালিক নিজ পুত্র ওয়ালিদের জন্য আগ থেকেই বাইয়াতটা নিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে চিঠি লিখে মুসলিমদের বাইয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়। ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মদিনার গভর্নর হিশাম ইবনু ইসমাইল আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে চিঠি লিখে জানায় যে, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ছাড়া গোটা মদিনাবাসীই ওয়ালিদ ও সুলাইমানের জন্য বাইয়াত দিতে রাজি। আবদুল মালিক চিঠি লিখে গভর্নরকে নির্দেশ দিলো, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবকে তরবারির ভয় দেখাও। যদি তাতেও না দমে, চাবুক মেরে মদিনার বাজারে বাজারে ঘোরাও।

আবদুল মালিকের চিঠি গভর্নরের কাছে পৌঁছার পরপরই সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের কাছে

সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, উরওয়াহ ইবনু যুবাইর ও সালিম ইবনু আবদিল্লাহ আসলেন। তাঁরা বললেন, আমরা আপনার কাছে একটি ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি। গভর্নরের কাছে আবদুল মালিকের নির্দেশ এসেছে। আপনি বাইয়াত না-দিলে আপনার গলা কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা আপনার সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখব। যেকোনো একটি বেছে নেবার সুযোগ থাকবে। গভর্নর আপনার ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দিতে রাজি হয়েছেন যে, তিনি আপনার সামনে খলিফাহর বাইয়াতনামা পড়ে শোনাবেন, কিন্তু আপনি হাঁ-না কিছুই বলবেন না।

তিনি জবাব দিলেন, 'তাহলে তো মানুষ বলবে, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বাইয়াত দিয়ে দিয়েছে। আমি তা করতে পারব না।' অর্থাৎ তিনি যদি 'না' বলেন, তাহলে তো তারা এই কথা বলতে পারবে না যে, তিনি 'হাঁ' বলেছেন। তখন আগন্তুক তিনজন বললেন—গভর্নর আপনাকে খুঁজে না-পেলে আপনার ওজর গ্রহণ করবেন। তিনি জবাব দিলেন—হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ আওয়াজ কান ভেদ করে শুনতে পাওয়া সত্ত্বেও আমি ঘরে বসে থাকব, এমন কাজ করতে পারব না। আগন্তুক তিনজন আবার অনুরোধ জানালেন, 'সালাতশেষে আপনি আপনার মজলিস ছেড়ে উঠে যাবেন। যখন গভর্নর লোক পাঠিয়ে দেখবে আপনি সেই মজলিসে নেই, সে আর আপনার পিছু নেবে না।' তিনি জবাব দিলেন, 'মানুষের ভয়ে আমি এমনটা করব?'[৩০৬]

তাঁর জবাব ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সবাইকে নিশ্চুপ করে দেয়ার মতো। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচলতা ও দৃঢ়পদতার রহস্য এই জবাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

▪ দুই

ঘটনাটি ইমাম আবু হানিফার। কুফায় একটি ছাগল হারিয়ে যায়। আর ছাগলটির মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত তিনি সব ছাগলের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাত বছর তিনি এভাবে বিরত থেকেছেন।[৩০৭] সম্ভাবনা ছিল হয়তো সেই নিষিদ্ধ ছাগলটি বেঁচে আছে। যার ফলে এর মাংস খেলে অন্তর কুলষিত হয়ে পড়বে। আর যদিও মূল বস্তু না-জেনে হারাম খেলে গুনাহ হয় না, তবে হারাম বস্তুর কুপ্রভাব হলো, অন্তর থেকে নুরের আভা চলে যায়।

---

[৩০৬] ইমাম আবু নুয়াইম আসফাহানি, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৭১-১৭২; ইমাম আবু নুয়াইম একাধিক সনদে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। [নিরীক্ষক]

[৩০৭] আল-আয়িম্মাতুল আরবাআ, পৃষ্ঠা : ৬৫; ইবনু হাজার আল-হাইতামি, আল-খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আবি হানিফা আন-নুমান, পৃষ্ঠা : ১৮

• তিন

ইমামুল হারামাইনের বাবার ঘটনা। ইমামুল হারামাইনের ইমামুল হারামাইন মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনির জীবনীতে আছে, তাঁর বাবা প্রথম জীবনে মজুরির বিনিময়ে কাপড় বুনে দিতেন। এভাবে পরিশ্রমের টাকা জমতে জমতে বেশকিছু টাকার সঞ্চয় হয়। টাকাগুলো দিয়ে তিনি কাজের উপযোগী ভালো একটি দাসী কিনলেন। তিনি নিজ উপার্জনের টাকা থেকেই দাসীটির খাবার ও ভরণ-পোষণের খরচ চালাতেন। একদিন সেই দাসীর গর্ভে ইমামুল হারামাইনের আগমন ঘটে। তাঁর বাবা হালাল উপার্জন থেকেই দাসীটির লালনপালন করতেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর বাবা দাসীকে অনুরোধ করলেন, সে যেন শিশুটিকে কোনোভাবেই অন্য কোনো মহিলার বুকের দুধ না-খাওয়ায়। একদিন তাঁর বাবা দাসীর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন সে ব্যথায় কোঁকড়াচ্ছে, অন্যদিকে শিশু ইমামুল হারামাইনও কাঁদছেন। তাঁদেরই এক নারী প্রতিবেশী শিশু ইমামুল হারামাইনকে আদর করে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ানোর জন্য স্তন দুটো এগিয়ে দিয়েছিলেন, আর শিশু ইমামুল হারামাইনও সামান্য খেয়ে নিয়েছিল।

এটা জেনে তাঁর বাবা খুব কষ্ট পান। শিশুকে কোলে নিয়ে মাথা উল্টো করে মৃদু ঝাঁকি দিলেন। তার পেটে হাত বোলালেন, মুখের ভেতর আঙুল প্রবেশ করালেন। এমন করতে করতে এক পর্যায়ে শিশুটি পানকৃত পুরো দুধ বমি করে বের করে দেয়। তিনি তখন বলছিলেন—মায়ের দুধ ছাড়া অন্য নারীর দুধ খেয়ে স্বভাবপ্রকৃতি নষ্ট হবার চেয়ে বাচ্চাটি মরে যাওয়া আমার কাছে আরও সহজ। ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি কোনো বিতর্কের মজলিসে কোনো বিষয়ে হোঁচট খেলে বলতেন—এটা সেই দুধপানের ফলাফল।[৩৩৮]

• চার

কাকা ইবনু হাকিম বলেন, 'আমি মাহদির মজলিসে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে সুফিয়ান সাওরিও এসে উপস্থিত হন। রাজদরবারে এসে মাহদিকে সাধারণভাবেই সালাম দিলেন তিনি। খলিফার সম্মানার্থে সালাম করেননি। তরবারিতে ঠেক লাগিয়ে খলিফাহর প্রহরী রাবি তাঁর মাথার কোণেই দাঁড়িয়েছিল। খলিফাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছে শুধু। মাহদি প্রফুল্ল চেহারায় সুফিয়ানের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "হে সুফিয়ান, আপনি এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে পালিয়ে বেড়ান। আর মনে মনে ভাবেন, আমরা চাইলেও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারব না। অথচ আমি এখন আপনার ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারি। আপনি কি ভয় পান না যে, আমি আপনার ব্যাপারে যেকোনো

[৩৩৮] মুনাওয়ি, ফাইজুল কাদির : ৪৫১৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ৩/১৬৯

লাঞ্ছনাকর নির্দেশ দিতে পারি?" তিনি জবাব দিলেন—আমার বিরুদ্ধে অন্যায় হুকুম জারি করলে আপনার বিরুদ্ধে এমন এক মহাক্ষমতাধর বাদশাহ ব্যবস্থা নেবেন, যিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তখন প্রহরী রাবি বলে উঠল, "হে আমিরুল মুমিনিন, কত বড় স্পর্ধা তার, এই মূর্খের কী এ ধরনের কথা বলার কোনো অধিকার আছে? অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দিই।" মাহদি বলল, "তোমার ধ্বংস হোক, চুপ করো। তোমার মতো অদূরদর্শী লোকেরাই চায় তাঁদের মতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে হত্যা করে আমরা দুর্ভাগা হই।" মাহদি নির্দেশ দিলো, কুফার সব কাযিদের ওপর সুফিয়ানের কর্তৃত্বনামা লিখে দাও, কেউ যেন তার নির্দেশের বিরোধিতা না-করে। কর্তৃত্বনামা লিখে তাঁর কাছে দেয়া হলো। তিনি সেটা নিয়ে বেরিয়ে যান। কর্তৃত্বনামাটি দজলায় ছুড়ে ফেলেন। এরপর অন্যত্র পালিয়ে যান তিনি। পুরো নগরজুড়ে খোঁজ করেও কোথাও পাওয়া গেল না তাঁকে।'[৩৩৯]

সুফিয়ান সাওরি (রাহিমাহুল্লাহ) কুফার বিচারকের দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে গেলে কাযি শারিক আন-নাখয়ি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোনো এক কবি বলেন,

'সুফিয়ান বিরত থেকে দ্বীন নিয়ে পালিয়ে গেল
আর শারিক দিরহামের জন্য ওত পেতে রইল।'[৩৪০]

▪ পাঁচ

ঘটনাটি সায়িদ আল-হালাবির।[৩৪১] ইবরাহিম পাশার সামনে সায়িদ হালাবির দৃঢ় অবস্থানের ঘটনায় আমি ভীষণ আন্দোলিত হই! সে অনেক বিত্ত ও প্রভাবশালী ছিল। ইবরাহিম পাশা শাইখ হালাবির সাথে দেখা করতে মসজিদে প্রবেশ করলে শাইখের মাঝে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না। তখনো শাইখ পা দুটো ছড়িয়ে বসেছিলেন। মানুষ তো দলে দলে সালাম জানিয়ে মুসাফাহা (করমর্দন) করতে লাগল। ইবরাহিম পাশা দীর্ঘক্ষণ শাইখ সায়িদ হালাবির সামনে বসে থাকে। শাইখ তখনো পা গুটিয়ে নেননি। অবশেষে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ফিরে যায়। পাশা একটি মুদ্রার থলে নিয়ে রক্ষীর কাছে দিয়ে বলল—এটা শাইখকে দিয়ে দেবে। শাইখ সায়িদ হালাবির বাড়িতে মুদ্রার থলেটা রাখা হলে শাইখ রক্ষীকে বললেন—যাও, তোমার পাশাকে গিয়ে বলো, যে ব্যক্তি পা বিছিয়ে রাখতে

---

[৩৩৯] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ২/৩৯০

[৩৪০] বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, বর্ণনা নং : ২০৭৩৫

[৩৪১] আবু উসমান সায়িদ ইবনু হাসান ইবনি আহমাদ হালাবি। শামের বিখ্যাত হানাফি আলিম। ফকিহ ও মুহাদ্দিস। বর্তমান সিরিয়ার হালাবে (আলেপ্পো) ১১৮৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ফকিহুশ শাম বলা হতো। দিমাশকের জামি বনি উমাইয়াতে দারস দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহাম্মাদ আমিন ইবনু আবিদিন। তিনি ১২৫৯ হিজরিতে হালাবেই মৃত্যুবরণ করেন। [নিরীক্ষক]

পাবে, সে হাত পাততে জানে না।[৩৪২]

যে সমাজ আকিদাহয় গড়া

এই সমাজ নিরাপদ। এ সমাজের প্রতিটি মানুষই মান-সম্মানের দিক দিয়ে নিরাপদ। যেমন, ব্যভিচার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। কোনো বিবাহিত লোক ব্যভিচার করলে পাথরের আঘাতে মৃত্যুশাস্তি ভোগ করার উপযুক্ত হয়ে যায়। এ সমাজের কোনো ব্যক্তি সামান্য শব্দ থেকেও নিরাপদ। চাই তার সম্মানে ছোট্ট একটি অপবাদমূলক শব্দ হোক। এই ছোট্ট একটা অপবাদমূলক শব্দ অপবাদদাতার ওপর জনসম্মুখে আশিটি দুররা (বেত্রাঘাত) আবশ্যক করবে। কোনো দূষিত শব্দে তার মান-মর্যাদা কলুষিত হবে না।

একজন মুসলিম তার সম্পদের ব্যাপারেও নিরাপদ। চুরি কবিরা গুনাহ। যে এক দিনারের একচতুর্থাংশ সমপরিমাণ অর্থ চুরি করবে, তার হাত কেটে দেয়া হবে।[৩৪৩] এমনকি একজন মুসলিম নিজ অর্থ-সম্পদ অন্যায় ও অবৈধ পথে নষ্ট করে ফেলা থেকেও নিরাপদ। সুদ হারাম করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গুদামজাত করে রাখাও অবৈধ। প্রতারণা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। আর জুয়া নাপাক। এ তো শয়তানের কাজ।

একজন মুসলিম নিজ প্রাণের ব্যাপারেও নিরাপদ। যে হাত অন্যায়ভাবে কারও রক্ত প্রবাহিত করতে প্রসারিত হয়, আর নিহতের পরিবার ও আত্মীয়রা হত্যাকারী থেকে কিসাস (প্রতিশোধগ্রহণের বিধান) নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে, তাহলে এই হাত কখনোই বাকি থাকবে না (অর্থাৎ এর কিসাস নেয়া হবে)। এটিই সর্বসম্মত মাসআলা।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

'আমি তাদের প্রতি বিধিবদ্ধ করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের

---

[৩৪২] আলি নাদবি, রাব্বানিয়াহ লা রাহবানিয়াহ (মুকাদ্দিমাহ)

[৩৪৩] রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

'এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।' (সহিহ বুখারি : ৬৭৯০)।

স্বর্ণমুদ্রাকে দিনার বলা হয়। বর্তমান পরিমাপে এক দিনারের ওজন—চার গ্রাম এবং আরও এক-চতুর্থাংশ গ্রাম। এই হিসেবে এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগের পরিমাণ দাঁড়ায়—এক গ্রাম এবং আরও এক গ্রামের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। এই পরিমাণ স্বর্ণ-মূল্যের সমপরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে। [নিরীক্ষক]

> বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে সমান আঘাত।'[৩৪৪]

একজন মুসলিমের জান, ধন-সম্পদ, সম্ভ্রম সবকিছু শাসকের কাছ থেকেও নিরাপদ। শাসক-শাসিত সবাই-ই শরয়ি বিধানের অধীন। কেউই শরিয়াতের বাইরে বের হওয়ার সক্ষমতা রাখে না।

এক প্রাণ, এক দেহ

এ সমাজের সব সদস্য একদেহের মতো। যদি এই শরীরের কোনো অঙ্গ জ্বরাক্রান্ত হয়, তো গোটা শরীরই জ্বর ও অনিদ্রা অনুভব করে। একদিন এক অসহায় সাহায্যপ্রার্থী নারী 'আমুরিয়া'[৩৪৫] অঞ্চল থেকে সাহায্য চেয়ে আর্তচিৎকার করেছিল। তখনই খলিফাহ সাহায্যের জন্য বাগদাদ থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে যান। এক মুসলিম নারীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আর্তচিৎকারে গোটা সৈন্যবাহিনী তাঁকে মুক্ত করতে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।[৩৪৬] ইসলামের এই সমাজ এমন এক সমাজ, যার ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন—যে সমাজে আবু বাকর রয়েছেন, সেখানে আমি কোনো বাড়তি অধিকার প্রয়োগ করতে যাব, এরচেয়ে বিনা অপরাধে তরবারি দিয়ে নিজ গলা নিজেই আলাদা করে দেয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়।[৩৪৭]

---

[৩৪৪] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৫

[৩৪৫] তুরস্কের রাজধানী আনকারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তৎকালীন আমুরিয়া শহরটির অবস্থান। বর্তমানে এর নাম সিফিলি হিসার। বনু উমাইয়া যুগে প্রথমবার ৮৯ হিজরিতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের ভাই মাসলামাহ ইবনু আবদিল মালিকের হাতে এই শহরের দুর্গ বিজয় হয়। দ্বিতীয়বার আব্বাসি খলিফাহ মুতাসিম বিল্লাহর মাধ্যমে ২২৩ হিজরিতে শহরটি মুসলিমদের অধিকারে আসে। [নিরীক্ষক]

[৩৪৬] ঘটনাটি সনদ বা সূত্রবিহীন, অর্থাৎ ভিত্তিহীন। এটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম ইবনুল আসির এককভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আব্বাসি খলিফাহ মুতাসিম বিল্লাহর শাসনকালে তাঁর কাছে সংবাদ এলো, এক হাশিমি মুসলিম মহিলা রোম রাজ্যে বন্দি অবস্থায় 'ও মুতাসিম' বলে চিৎকার করেছে। খলিফাহ সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে বেরিয়ে পড়েন। (ইবনুল আসির, আল-কামিল ফিত তারিখ : ৬/৩৮, শিরোনাম : আমুরিয়া বিজয়ের আলোচনা)। ইবনুল আসির এই ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি এর ৪০০ বছর পরের লোক। ৬৩০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু। মহিলাটি আমুরিয়াতে ছিল কি না, তাও তিনি বলেননি এবং এও বলেননি যে, মুতাসিম ওই মহিলাকে উদ্ধার করলো কি না। পক্ষান্তরে ইমাম তাবারি, মাসউদি, ইয়াকুব ও ইবনু কাসিরের মতো ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা বর্ণনা করেননি। তাঁরা শুধু মুতাসিমের আমুরিয়া বিজয়ের বিবরণটাই উল্লেখ করেছেন। [নিরীক্ষক]

[৩৪৭] তারিখুল খুলাফা : ১/১০৪

ইমাম শাফিয়ি এই সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ব্যাপারে বলেন,

> 'লোকেরা বলে—কী ব্যাপার, আহমাদ আপনার সাথে দেখা করতে আসে, আপনিও তার সাথে দেখা করতে যান! আমি বললাম, "আরে মহৎ গুণাবলি তার আঙিনা ছেড়ে কোথাও যায় না। যদি তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন, তবে তো সেটি তার অনুগ্রহ, বিনয় ও মহত্ত্ব। আর যদি আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাই, তবুও সেটি তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণেই। উভয় অবস্থায়ই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতা এবং বিনয়-বিনম্রতা তাঁরই।"'[৩৪৮]

আবার ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম শাফিয়ির ব্যাপারে বলেন,

> 'ইমাম শাফিয়ি সূর্যের মতো, যা দুনিয়ার জন্য অপরিহার্য। তিনি সুস্থতার মতো, যা দেহের জন্য অপরিহার্য। তোমরাই বলো, সূর্য আর সুস্থতার কোনো বিকল্প আছে কি?'[৩৪৯]

তিনি আরও বলেন—আমি তিন-তিনটি বছর এমন কোনো রাত কাটাইনি, যে রাতে ইমাম শাফিয়ির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিনি।[৩৫০] ইমাম শাফিয়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন—ফিকহের ব্যাপারে মানুষ ইমাম আবু হানিফার পরিবারভুক্ত।[৩৫১]

ইসলামি সমাজ পরিচ্ছন্ন সমাজ। সেখানে এমন কোনো ফেনা (ময়লা-আবর্জনা) নেই, যা এই সমাজের ওপর ভেসে থাকতে পারে। এমন কোনো পঙ্কিলতা ও জটিলতাও নেই, যা এই সমাজের স্বচ্ছতাকে কর্দমাক্ত করতে পারে। এই সমাজেই আবু বাকরের সময়ে (খিলাফাত) পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত কোনো একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।[৩৫২]

---

[৩৪৮] ইমাম সাফারিনি, গিযাযুল আলবাব : ১/৪৩৯

[৩৪৯] ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৫০

[৩৫০] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ৪/১৬৪

[৩৫১] মিযযি, তাহযিবুল কামাল : ২৪/৩৭২

[৩৫২] বর্ণনাটি দয়িফ। দুটো মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঘটনাটি। একটি মুহারিব ইবনু দিসার থেকে বর্ণিত—ইমাম বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা : ২০১৫৬। মুহারিব আবু বাকর কিংবা উমার কাউকেই পাননি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১১৬ হিজরিতে, আর উমার মারা গেছেন ২৩ হিজরিতে। তাই, এটা মুরসাল বর্ণনা। দ্বিতীয় বর্ণনাটি আতা ইবনুস সায়িব থেকে বর্ণিত—ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক : ৩০/৩২১; ইবনু সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা : ৩/১৩৭। এই বর্ণনায় পুরো কাহিনির বর্ণনাকারী হলেন আতা ইবনুস সায়িব। তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের বক্তব্য হলো, তিনি ইখতিলাত করতেন। অর্থাৎ বর্ণনা করতে গিয়ে একটির সাথে আরেকটি মিশিয়ে ফেলতেন। আর সবচেয়ে

এ সমাজ অভাবমুক্ত সমাজ। উমার ইবনু আবদিল আযিযের শাসনামলে ইয়াহইয়া ইবনু সায়িদ আফ্রিকা অঞ্চলের যাকাত সংগ্রহ করে দীর্ঘ একমাস যাবৎ ঘোষণাই দিতে থাকেন, যেন যাকাতের হকদাররা এসে নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে যায়। কিন্তু কেউই এলো না। অবশেষে খলিফাহ এগুলো দিয়ে দাস-দাসী কিনে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ সমাজ পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যে পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সমাজ, যেখানে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি, সূক্ষ্ম কোনো ফাঁকফোকরও নেই। এই সমাজে ফাটল ধরানোসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার সামর্থ্য কোনো বহিরাগত দলের নেই। যেমন, কাব ইবনু মালিকের নাজুক সময়ে[৩৫৩] গাসসানের বাদশাহ তাঁকে প্ররোচিত করতে থাকে। কুরআন তাঁর এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে,

حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

'ফলে যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। আর তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।'[৩৫৪]

এমন এক নাজুক সময়, যখন গোটা মদিনাবাসী তাকে বয়কট করে। তাঁর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। সেই ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিসহ আমার সেই দুই সাথির সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন।[৩৫৫]

কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

বড় কথা হলো, তিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাননি। তাঁর মৃত্যু ১৩৬ হিজরিতে। রাবি দয়িফ হওয়ার পাশাপাশি বর্ণনাটা মুরসালও। [নিরীক্ষক]

[৩৫৩] তাবুক যুদ্ধের সময়ে কাব ইবনু মালিকসহ আরও দুজন সাহাবি (হিলাল ইবনু উমাইয়াহ ও মুরারাহ ইবনু রবি) অলসতাবশত যেতে পারেননি। তাঁরা যেতে আগ্রহী ও সক্ষমও ছিলেন, কিন্তু আজ নয় কাল করতে করতে আর যাওয়া হয়নি। এ দিকে দেখা গেল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবিদের নিয়ে মদিনায় ফিরে এসেছেন। মদিনায় থেকে যাওয়া অন্যান্য মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা দেখিয়ে বেঁচে গেলেও তাঁরা তিনজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো বাহানা না-দেখিয়ে সত্যটাই বলে দিলেন। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেন। পর্যায়ক্রমে সমাজ ও পরিবার থেকেও বয়কট করালেন। এমতাবস্থায় কাব ইবনু মালিকের কাছে গাসসানের খ্রিষ্টান গভর্নরের চিঠিটা এল। এরপর প্রায় পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাঁদের তাওবাহ কবুল করেন। (সহিহ বুখারি : ৪৪১৮) [নিরীক্ষক]

[৩৫৪] সুরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১১৮

[৩৫৫] সহিহ বুখারি : ৪৬৭৭

'আমি মদিনার বাজার দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ শাম থেকে আগত এক ব্যবসায়ী আমার সামনে পড়ল। সে খাবার বিক্রি করছিল আর বলছিল, "কেউ কি আছ যে আমাকে কাব ইবনু মালিকের সন্ধান দিতে পারবে?" লোকেরা ইশারা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলো। সে আমার কাছে এসে গাসসানের বাদশাহর একটি চিঠি ধরিয়ে দেয়। আমি লেখাপড়া জানতাম। দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে, "হে কাব, শুনেছি তোমার সাথি তোমার ওপর অন্যায় করেছে। আল্লাহ তো তোমাকে অপমান আর বঞ্চনায় পড়ে থাকতে বাধ্য করেননি। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমার প্রতি সহমর্মিতা দেখাব।"'

তিনি বলেন,

'এটা পড়ার সময় আমার মনে হতে লাগল, এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। আমি চিঠিটা আগুনে জ্বালানোর ইচ্ছা করলাম। জ্বালিয়েই দিলাম।'[৩৫৬]

এই ইসলামি সমাজব্যবস্থা সত্যিই বড় বিস্ময়কর। দেখুন, গাসসানের বাদশাহ পর্যন্ত একজন সমাজচ্যুত মুসলিমকে নিজ দলে ভেড়াতে পারেনি, অথচ তখন বসবাসের ভূমিই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। যেসব মানুষের সাথে বসবাস এবং বেড়ে ওঠা, তাঁরাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এ এমন এক ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যার প্রতিটি সদস্যের হৃদয় এক ও অভিন্ন। তাঁরা আমিরের আদেশের প্রতি যত্নবান। তাঁরা আমিরের দিকনির্দেশনায় চলাফেরা করেন। তাঁদের মহান আমিরের সামান্য দেখাতেই তাঁদের চোখমুখে হাসি ফুটে ওঠে। এই সমাজই কাব ইবনু মালিককে সমাজচ্যুত করেছিল। সাহাবা কিরাম তাঁর সাথে কথা বলাসহ সালামের উত্তর দেয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি একটি কথাও কারও মুখ থেকে শুনতে পাননি। তাঁরা শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নিষেধবাক্য শোনামাত্রই এমন করেছিলেন।

শেষ অনুরোধ

হে প্রজন্মের সন্তানেরা, মানুষ গঠন এবং সমাজ বিনির্মাণে আকিদাহ ও এর প্রভাব নিয়ে এটি খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমরা এই স্বল্প সময়ে আকিদাহর ভিত্তি তুলে ধরেছি। আকিদাহয় যখন বিকৃতি ঢুকে পড়ে, তখন সমাজজীবনের ভয়াবহ বিচ্যুতির প্রভাব নিয়েও আলোকপাত করেছি। আমি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে, আজকের মানবজাতি যেই দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগে দিন পার করছে, তার মূল কারণ দ্বীনি আকিদাহকে গুরুত্বহীন মনে

[৩৫৬] সহিহ বুখারি : ৪৪১৮

করা। এমনকি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝেও এই বিচ্ছিন্নতা-বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান হয়ে পড়ল দ্বীন ও গাইবি বিষয়ের মারাত্মক এক প্রতিপক্ষ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, অবশেষে দেরিতে হলেও বিজ্ঞান বাস্তবতার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। নতুন নতুন প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে ইসলামের কোনো বিবাদ নেই। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান[৩৫৭] ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

হে নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা, এই আকিদাহর ছায়ায় ফেরা ছাড়া কোনো পথ নেই। এর দিকে ফেরা তোমাদের জন্য আবশ্যক। এ বিষয়টি তোমরা তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেতে চাইবে এবং নিজেদের হৃদয়কে নতুন করে বিনির্মাণের শপথ নেবে। কিন্তু তোমরা যদি এই অশুভ পথেই হাঁটতে থাক, তবে নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। দুনিয়াও হারাবে, আখিরাতও হারাবে।

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।'[৩৫৮]

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'সে ইহ-পর উভয়কালেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।'[৩৫৯]

মানবজাতি তার ফিতরাতের (স্বভাব-প্রকৃতি) কারণে এই দুর্ভাগ্য আর অনিষ্টতা বয়ে বেড়াতে পারবে না। কিন্তু মানবজাতির সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে, ভয়ঙ্কর সব চড়াই-

---

[৩৫৭] মনোবিজ্ঞান হলো মন বা আত্মার বিজ্ঞান। এই বিষয়টা মূলত মনঃস্বাস্থ্য, মনের চাহিদা ও মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। ইসলাম এই বিষয়ের বিরোধী নয়, বরং মানবাত্মা পরিশুদ্ধির জন্যই ইসলাম এসেছে। মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামই সঠিক মনোবিজ্ঞানের দিকনির্দেশনা দেয়। কিন্তু প্রচলিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ইসলামবহির্ভূত বা ইসলামবিরোধী অনেক বিষয় যুক্ত। বিংশ শতকের শুরুর দিকে অস্ট্রিয়ার ডা. সিগমুন্ড ফ্রয়েড আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটান। যেহেতু কাফিরদের হাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি, এদের হাতেই এর গবেষণা, পরিচর্যা ও বিকাশ হয়েছে, তাই এটা মানুষকে রুহানিয়াত দেবে এমন কল্পনা করাও অসম্ভব। মনোবিদরা ইসলাম থেকে দূরে থাকার ফলে মানুষকে সঠিক নির্দেশনা তো দিতে পারছেই না, উপরন্তু তারা ইসলামবিরোধী এমন এমন তত্ত্ব পেশ করছে, যা একজন মানুষের দুনিয়া-আখিরাত দুটোই বরবাদ করতে যথেষ্ট। তাই, মনোবিজ্ঞান থেকে উপকৃত হতে, আত্মার সংশোধন ও মনের প্রশান্তি পেতে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে আসতে হবে। এ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। [নিরীক্ষক]

[৩৫৮] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮

[৩৫৯] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ১১

[illegible] যাওয়া-আসার প্রবণতা তার মাঝে রয়েই গেছে। অতএব সমাজতন্ত্র, [illegible]বাদ ও পুঁজিবাদের মতো বাতিল জীবনদর্শনগুলোর ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়াসহ এগুলোতে বিধ্বস্ত হবার পর তাদের ফিরে আসা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যে বঞ্চনার শিকার। তোমরা ফিরে এসো। ইসলামকে বুকে ধারণ করো। কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার অপেক্ষায় থাকা দুর্ভাগা মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দাও। তোমরা যাঁদের প্রতি আস্থা রাখো এবং যাঁদের মনে করো তাঁরা ইলম ও আমল দিয়ে এই মহান দ্বীন বয়ে নিচ্ছেন, এই দ্বীনের আলো ও আভায় নিজেদের আকিদাহর জগৎ শোভিত করেছেন, ইবাদত আর জীবনবিধানকে এই মহান দ্বীনের নির্মল আলো দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন—তবে তাঁদের কাছে যাও, তাঁদের পাশে জড়ো হও।

সবশেষে আমি আপনাদের একটি অনুরোধ করছি। আপনারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রত্যেকেই নিজের সাথে সার্বক্ষণিক কুরআনের ছোট একটি কপি রাখেন। বিশ্বজগতের রব আল্লাহ আপনার কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, যেন তা বুঝতে পারেন, নিয়মিত অধ্যয়ন বজায় রাখতে পারেন। হাদিসের ছোট একটি কিতাব সাথে রাখুন। যেমন, রিয়াদুস সালিহিন।[৩৬০] আর সবারই সাইয়িদ আবুল আলা মাওদুদি, সাইয়িদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব[৩৬১], সায়িদ হাওয়া[৩৬২], সাইয়িদ আলি নাদবির গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা উচিত।[৩৬৩]

---

[৩৬০] ইমাম নাওয়াবির বিখ্যাত হাদিস-সংকলন। [ভা. স.]

[৩৬১] মুহাম্মাদ কুতুব [২৬ অক্টোবর, ১৯১৯—৪ এপ্রিল, ২০১৪] : মিশরীয় আলিম, সাহিত্যিক ও দায়ি। তিনি ছিলেন উসতায সাইয়িদ কুতুবের ছোট ভাই। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদের শিক্ষক। সৌদিতে বিভিন্ন স্তরের সিলেবাস প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন তিনি। মুহাম্মাদ কুতুব কিং ফায়সাল পুরস্কারও পান। ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ আল-কাহতানির প্রসিদ্ধ বই 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' থিসিস পেপার তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। এ ছাড়াও ড. সাফর আল-হাওয়ালির থিসিস পেপারেও তাঁর তত্ত্বাবধান ছিল। [ভাষা-সম্পাদক]

[৩৬২] সায়িদ ইবনু মুহাম্মাদ হাওয়া [২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫—৯ মার্চ, ১৯৮৯] : সিরিয় আলিম, বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও দায়ি। সিরিয়ার হামা শহরে তাঁর জন্ম। তিনি ১৯৬১ সালে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশ শরিয়াহয় পড়াশোনা শেষ করেন। ড. মুসতাফা আস-সিবায়ি, শাইখ আবদুল কারিম রিফায়ির মতো ব্যক্তিবর্গ তাঁর উসতায। তাঁর লিখিত প্রায় ১৮টির মতো বই আছে। এর মাঝে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত 'আল-আসাস ফিত তাফসির', ১৪ খণ্ডের 'আল-আসাস ফিস সুন্নাতি ওয়া ফিকহিহা' এবং 'আল-আসাস ফি কাওয়ায়িদিল মারিফাতি ওয়া যাওয়াবিতিল ফাহমি লিন-নুসুস' উল্লেখযোগ্য বই। [নিরীক্ষক]

[৩৬৩] কারও লেখনীর সবকিছুই যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি ভুল বা বিচ্যুতিও থাকে। বই পড়তে গিয়ে ভুল-সঠিকের ধারণা মাথায় রাখা উচিত এবং সেগুলো কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের মাপকাঠিতে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সত্যপন্থী উলামা কিরামের পরামর্শের বিকল্প নেই। [নিরীক্ষক]